ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
দ্বাবিংশতিতম সংখ্যা
মার্চ ২০০২; চৈত্র ১৪০৮

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

Sl
27803

লোক প্রশাসন সাময়িকী

দ্বাবিংশতিতম সংখ্যা, মার্চ ২০০২/চৈত্র ১৪০৮

সৌজন্য সংখ্যা

সম্পাদনা পরিষদ

মোশারফ হোসেন
সৈয়দ শামসুল আলম
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
কাজী হাসান ইমাম
বেগম কঙ্কা জামিল

সম্পাদক

এস, এম, জোবায়ের এনামুল করিম

বিপিএটিসি গ্রন্থাগার
সাময়িকী শাখা
সাভার, ঢাকা

লোক প্রশাসন সাময়িকী

দ্বাবিংশতিতম সংখ্যা, মার্চ ২০০২/চৈত্র ১৪০৮

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের
ত্রৈমাসিক জার্ণাল

সম্পাদক ঃ এস, এম, জোবায়ের এনামুল করিম

© বাংলাদেশ লোক- প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৪০৮

টেলিফোন	ঃ	৭৭১০০১০-১৬ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স	ঃ	৭৭১০০২৯
ই-মেইল	ঃ	bpatc@sdnbd.org
বিপিএটিসি গ্রন্থাগার	ঃ	৩৫১.০০০৫
প্রচ্ছদ	ঃ	বোনাফাইড
মূল্য	ঃ	১৮০ টাকা
		US $ 10
মুদ্রণে	ঃ	**বোনাফাইড প্রিন্টার্স**
		১১২, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
		ফোন ঃ ৯৩৫০৩৬৪, ৯৩৫৩৪১৪

LOK PROSHASON SAMOEEKY
Vol. 22, March 2002/ Chaitra 1408

Quarterly Journal of
Bangladesh Public Administration Training Centre

Editor: S. M. Zobayer Enamul Karim

@ Bangladesh Public Administration Training Centre 1408

Telephone	:	7710010-16 (PABX)
Fax	:	7710029
E-Mail	:	bpatc@sdnbd.org
BPATC Library	:	351.0005
Price	:	Tk. 180
		US $ 10

লোকপ্রশাসন সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধকারদের। প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব এবং এর জন্য সম্পাদনা পরিষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

লোক প্রশাসন সাময়িকী

দ্বাবিংশতিতম সংখ্যা, মার্চ ২০০২/চৈত্র ১৪০৮

সূচিপত্র

অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতির মাধ্যমে দেশে প্রযুক্তির স্থানান্তর
প্রক্রিয়া কিভাবে শক্তিশালী করা যায়? ১
মোহাম্মদ আবদুল্লাহ

ঘূর্ণাবর্তে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার
কতিপয় সাম্প্রতিক বিতর্ক ২৩
আনোয়ার পাশা

Civil Servants of Some Developed
Democracies in a Comparative Vein ৫১
Kazi S.M. Khasrul Alam Quddusi

ব্যবসার সামাজিক গুরুত্ব ও নৈতিক দায়বোধ
প্রসঙ্গ ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত ৬৭
এ.এস.এম. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া

Human Development Index: A Study on Two
Selected Villages of Bangladesh ১০৩
S.M. Zobayer Enamul Karim

ISSN 1605-2021

লোক প্রশাসন সাময়িকী
দ্বাবিংশতিতম সংখ্যা,
মার্চ ২০০২/চৈত্র ১৪০৮

অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতির মাধ্যমে দেশে প্রযুক্তির স্থানান্তর প্রক্রিয়া কিভাবে শক্তিশালী করা যায় ?

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ *

How to Strengthen Technology Transfer Process through Reverse Engineering in Bangladesh

Mohammed Abdullah

Abstract: *Reverse Engineering is a robust mechanism of transfer and diffusion of technology. In this mechanism, technological capabilities are accumulated over time, which further generates abilities to develop new technology to cater for the local needs. Many developing countries exploited the potential of this mechanism to enhance indigenous capability of generating technology with appropriate policy support. But in our country due to lack of formal policy support huge potential of this mechanism remained untapped. Entrepreneurs and workers practicing this method are facing various constraints, which are hindering their capability building to make any significant contribution to develop indigenous technology. This paper figures out constraints of this mechanism and recommends some measures that can be adopted to make a better utilization of this mechanism to achieve technology transfer and diffusion in the short run and development of indigenous technology in the long run.*

*সহকারী অধ্যাপক, ইনষ্টিটিউট অব এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজী, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতির মাধ্যমে দেশে প্রযুক্তি স্থানান্তর প্রক্রিয়া কিভাবে শক্তিশালী করা যায়?
মোহাম্মদ আবদুল্লাহ

১। ভূমিকা

অনুকরণ প্রকৌশল (reverse engineering) পদ্ধতিতে কোন পণ্য বা প্রযুক্তি দেখে অনুরূপ পণ্য বা প্রযুক্তি তৈরী করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উন্নয়নের গতিধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতি প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতির দু'টি ধাপ থাকে। প্রথম ধাপে অন্য এক জন উৎপাদকের কোন একটি পণ্যের অনুরূপ একটি পণ্য উৎপাদন করার দক্ষতা ও ক্ষমতা অর্জন করা হয় এবং দ্বিতীয় ধাপে পণ্যের কার্যক্ষমতা, আকার ইত্যাদির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে আরও উন্নত ও কার্যকর পণ্য উৎপাদনের দক্ষতা ও ক্ষমতা অর্জিত হয়। এ পদ্ধতিতে দেখে শেখা ও জানার মাধ্যমে পণ্য বা প্রযুক্তি উৎপাদন ও উদ্ভাবনের দক্ষতা অর্জিত হয়। এ জন্য এই পদ্ধতিকে প্রযুক্তি হস্তান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ঢাকার ধোলাইখালসহ দেশের বিভিন্ন হাল্কা প্রকৌশল ওয়ার্কশপসমূহে অনুকরণ প্রকৌশলের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এসব ওয়ার্কশপের শ্রমিকদের কাছে কোন মেশিন বা যন্ত্রাংশ তৈরী করতে দিলে এরা হুবহু একই রকম মেশিন বা যন্ত্রাংশ তৈরী করে দিতে পারে, যদিও প্রস্তুতকৃত মেশিন বা যন্ত্রাংশ গুণগত মানের দিক দিয়ে আসল মেশিন বা যন্ত্রাংশের সমকক্ষ হয় না। ডিজাইন, ড্রয়িং, স্পেসিফিকেশন ও পণ্যের উপকরণ (material) সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবেই এরা আসল পণ্যের অনুরূপ গুণগত মান নিশ্চিত করতে পারে না এবং অনুকরণ প্রকৌশলের প্রাথমিক পর্যায় থেকে পরবর্তী পর্যায়ে নিজেদের দক্ষতা উন্নত করতে পারে না। কিন্তু সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে এদেরকে যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত করে তুললে ও এদের বিকাশের জন্য আর্থিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করলে এদের মাঝে উদ্ভাবনী ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে এবং এরা দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির চাহিদা পূরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশে যদিও সরকার অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দান করেছে[১], কিন্তু আমাদের দেশে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারকদের মাঝে ধারণা রয়েছে যে অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতি প্রযুক্তি চুরির একটি পন্থা মাত্র যার পৃষ্ঠপোষকতা করা অন্যায়। এ জন্য তাদের মধ্যে এই শিল্পের বিকাশে উদার নীতিমালা গ্রহণ তথা সক্রিয়ভাবে পৃষ্ঠপোষককতা করার ব্যাপারে দ্বিধা রয়েছে যা এই শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রযুক্তি গ্রহণ, উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে এই শিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের দক্ষতা অনুকরণের পরবর্তী ধাপ উদ্ভাবন পর্যায়ে উন্নীত করতে পারলে এই পদ্ধতি প্রযুক্তি চুরির পদ্ধতি নয় বরং প্রযুক্তি উদ্ভাবনের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দেশে প্রযুক্তির চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। তবে যে সব প্রযুক্তির প্যাটেন্ট কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অনুকরণের জন্য কেবলমাত্র সে সব প্রযুক্তি নির্বাচন করলে প্রযুক্তি চুরির অভিযোগ এড়ানো সম্ভব। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, পৃথিবীর বহু উন্নত দেশে অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতি প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। উদাহরণস্বরূপ এশিয়ায় জাপান, দঃ কোরিয়া ও তাইওয়ানের প্রযুক্তিগত উন্নয়নে এই পদ্ধতির অবদান অনস্বীকার্য। আমাদের দেশেও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে এই পদ্ধতির বিকাশ ঘটিয়ে দেশীয় প্রযুক্তির উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব। এ জন্য সরকারের কি ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত তা আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

প্রযুক্তির চাহিদা পূরণ ছাড়াও অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতি দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। হাল্কা প্রকৌশল ওয়ার্কশপের সাথে এর সম্মুখ ও পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পের কথা বিবেচনা করলে কর্মসংস্থানে এর গুরুত্ব সহজেই অনুধাবন করা যায়। এ ছাড়া এই পদ্ধতিতে কম মূল্যে দেশের বিভিন্ন শিল্প-কারখানাতে যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা সম্ভব, যা এসব শিল্পের স্থির ব্যয় হ্রাস করে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। কাজেই অর্থনীতিতে এই পদ্ধতি অনুশীলনরত শিল্পগুলোর অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

---

[১] বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় প্রতি বছর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজীকে অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে।

২। অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতি ও প্রযুক্তির স্থানান্তর

অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতিতে প্রযুক্তির স্থানান্তর ঘটে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করার পর। প্রযুক্তির স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয় যখন উদ্যোক্তারা অনুকরণের জন্য একটি পণ্য বা যন্ত্র নির্বাচন করেন এবং সম্পন্ন হয় নতুন পণ্য বা যন্ত্র তৈরীর মধ্য দিয়ে। এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ নিচে আলোচনা করা হল।

উদ্যোক্তারা প্রথম ধাপে অনুকরণের জন্য একটি পণ্য নির্বাচন করেন। পণ্য নির্বাচনের জন্য প্রথমে একটি পণ্য ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয় উদ্যোক্তার নিজস্ব উৎপাদন ক্ষেত্র, ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ও শ্রম শক্তির মেধা, দক্ষতা ও ক্ষমতা বিবেচনা করে। পণ্য ক্ষেত্র নির্ধারণের পর বাজার চাহিদার নিরিখে এই ক্ষেত্র থেকে তারা একটি পণ্য চিহ্নিত করেন। এ জন্য তারা বাজার চাহিদা ছাড়াও পণ্যটির প্রযুক্তিগত কার্যক্ষমতা ও তুলনামূলক ব্যয় বিবেচনায় রাখেন। এরপর তারা চিহ্নিত পণ্য সংগ্রহ করেন এবং পণ্যের প্রযুক্তিগত দিক বিশ্লেষণের জন্য পণ্যের বিভিন্ন অংশকে বিযুক্তিকরণ করেন। পরবর্তী ধাপে তারা বিযুক্তিকৃত অংশ সমূহের গুণাগুন, ব্যবহারিক ও প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও প্রস্তুত প্রণালী নিরূপণ করেন। বৈশিষ্ট্য নিরূপণে আকার (Design), প্রাকৃতিক (Physical), রাসায়নিক, ধাতব, সৌন্দর্যগত (aesthetic), কার্যগত (functional), ও গুণগত মান, জটিলতার মাত্রা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

উদ্যোক্তারা কেবলমাত্র একটি পণ্য নির্বাচন করে তা অনুসরণ করে অনুরূপ পণ্য তৈরী করতে পারেন। কিন্তু পণ্যের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে শংকর ধরনের পণ্য প্রস্তুত করার পরিকল্পনা থাকলে একাধিক পণ্য নমুনার বিযুক্তিকৃত অংশসমূহের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মিল-অমিল তারা নিরূপণ করেন। তারপর তারা অংশসমূহের উৎপাদনের জটিলতা, যন্ত্রাংশের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য, উৎপাদনের জন্য কাঁচামালের সহজ লভ্যতা, উৎপাদন খরচ ইত্যাদির বিচারে সংগৃহীত নমুনাসমূহের সর্বোৎকৃষ্ট প্রযুক্তিগত গুণাগুন ও ফাংশনাল বৈশিষ্ট্য সম্বলিত অংশসমূহ নিয়ে পরবর্তিত বা পরিবর্ধিত শংকর পণ্যের ডিজাইন প্রস্তুত করেন।

এর পর (নির্বাচিত) অংশসমূহের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পাইলট পণ্য প্রস্তুত করা হয়। পাইলট পণ্য তৈরীর সময়ে ভবিষ্যতে বাণিজ্যিক উৎপাদনের

জন্য যে সমস্ত অবকাঠামোর প্রয়োজন হবে তা মূল্যায়ন করা হয়। এ পর্যায়েই উদ্যোক্তারা প্রসেস লে-আউট এর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যাতে পণ্যের গুণগত মান বজায় থাকে। পরবর্তী ধাপে পাইলট পণ্যের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয় ও উৎপাদন খরচ নিরূপণ করা হয়। উৎপাদন খরচ গ্রহণযোগ্য হলে ও পাইলট পণ্য কার্যকর প্রমাণিত হলে সেটি উৎপাদনের জন্য পরবর্তীতে প্রসেস স্থাপন করা হয় ও পণ্য উৎপাদন করা হয়। সর্বশেষ ধাপে পণ্যটির মান আরও উন্নত এবং উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য শপফ্লোর ও ফর্মাল উভয় ক্ষেত্রেই গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ ক্রমাগত ভাবে অব্যাহত থাকে। অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতিতে এভাবে অনুকরণরত শিল্পগুলোর মাঝে প্রযুক্তির স্থানান্তর ঘটে। চিত্র-১ এ অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতিতে প্রযুক্তি স্থানান্তরের বিভিন্ন ধাপ দেখানো হয়েছে।

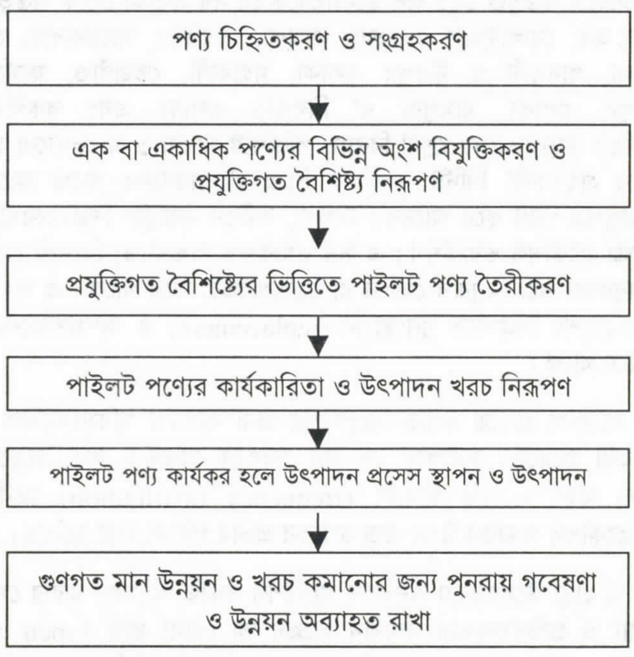

চিত্র-১: অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতিতে প্রযুক্তি স্থানান্তরের বিভিন্ন ধাপ।

৩। গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এই গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুকরণ প্রকৌশলে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন দুর্বলতা ও প্রতিবন্ধকতা সনাক্ত করা এবং এই পদ্ধতি যাতে দেশে প্রযুক্তির চাহিদা পূরণে যথাযথ অবদান রাখতে পারে সে জন্য এর বিকাশ ও উন্নয়নকল্পে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অনুকরণ প্রকৌশলে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয় এবং সম্প্রতি ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। উপাত্ত সংগ্রহের কাজে নমুনা কাঠামো (sampling frame) হিসেবে বাংলাদেশ শিল্প মালিক সমিতির সদস্যদের তালিকা অনুসরণ করা হয় এবং উদ্দেশ্যমূলক (purposive) নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। নমুনা যেন সমষ্টি (population) এর প্রতিনিধিত্ব করে তা নিশ্চিত করার জন্য নমুনা কাঠামো থেকে কমপক্ষে শতকরা পাঁচ ভাগ উদ্যোক্তাকে নমুনাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জরীপে অন্তর্ভুক্ত ১২১ জন উদ্যোক্তাকে যে সব এলাকা থেকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হল: ধোলাইখাল ও সংলগ্ন এলাকা, জিনজিরা, সায়েদাবাদ, জুরাইন, পোস্তাগোলা, গাবতলী ও মীরপুর এলাকা, মহাখালী, তেজগাঁও, ফার্মগেট ও মোহাম্মদপুর এলাকা, রামপুরা ও খিলগাঁও এলাকা এবং বকশীবাজার। এলাকাভিত্তিক উদ্যোক্তাদের শ্রেণী বিন্যাস পরিশিষ্টে সারণী-১ এ দেখানো হয়েছে। সাক্ষাতকার গ্রহণকারী নির্দিষ্ট এলাকায় গিয়ে উদ্যোক্তাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র পূরণ করে আনেন। উল্লেখ্য, জরীপে অন্তর্ভুক্ত শিল্প-কারখানাগুলো মূলত: হাল্কা প্রকৌশল ওয়ার্কশপ। এ সব ওয়ার্কশপ সাধারণত: বিদেশী মেশিন বা যন্ত্রাংশ অনুকরণ করে অনুরূপ মেশিন বা যন্ত্রাংশ তৈরী করে থাকে। এ সব মেশিন বা যন্ত্রাংশ দেশের শিল্পখাতে পুন:স্থাপন (replacement) ও সম্প্রসারণের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আলোচ্য প্রবন্ধে উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য সাধারণ পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সমীক্ষায় যে সব চলককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার প্রত্যেকটির ঘটন সংখ্যার বিন্যাস (frequency distribution) তৈরী করে অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতির উপর উক্ত চলকের প্রভাব পরীক্ষা করা হয়েছে।

এ ছাড়া উদ্যোক্তারা অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন তা খোলা প্রান্ত (open ended) প্রশ্নের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী জেনে নেন এবং লিপিবদ্ধ করেন। এর ভিত্তিতেই এ পদ্ধতির সমস্যাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪। অনুকরণ প্রকৌশলে নিয়োজিত শিল্পসমূহের বৈশিষ্ট্য

পরিশিষ্টে সংযুক্ত সারণী-২ থেকে দেখা যাচ্ছে অনুকরণ প্রকৌশলে নিয়োজিত উদ্যোক্তাদের গড় বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। এদের গড়ে প্রায় ৮ বৎসরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ১০ বৎসরের কর্ম অভিজ্ঞতা রয়েছে। সর্বাধিক সংখ্যক উদ্যোক্তার বয়স ৩১ থেকে ৫০ বৎসর বয়স সীমার মধ্যে। প্রায় ৭৮ শতাংশ উদ্যোক্তারই বয়স ৩০ এর উর্ধ্বে। উচ্চ বয়স শ্রেণীতে অধিক সংখ্যক উদ্যোক্তার উপস্থিতি নির্দেশ করে যে, তারা দীর্ঘদিন এ পেশায় নিয়োজিত। একই সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ উদ্যোক্তাই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাননি। প্রায় শতকরা ৫৬ ভাগ উদ্যোক্তা প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করেছেন। শতকরা ৭৪ ভাগ উদ্যোক্তা মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বা তার কম পড়াশুনা করেছেন। কেবলমাত্র শতকরা ৯ ভাগ উদ্যোক্তা স্নাতক বা তদুর্ধ ডিগ্রী অর্জন করেন। উদ্যোক্তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থেকে এটা স্পষ্টত ঃ প্রতীয়মান হচেছ যে, উচ্চ শিক্ষিত লোকদের অনুকরণ প্রকৌশল শিল্পে আত্মনিয়োগের ব্যাপারে আগ্রহ কম। জরীপে দেখা যায়, উদ্যোক্তাদের মাঝে প্রশিক্ষণেরও অভাব রয়েছে। কেবলমাত্র শতকরা ১৬ জন উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ পান। এর মধ্যে উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে ৮৯.৪৭% এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে ১০.৫৩% উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ লাভ করেন।

সারণী-২ থেকে দেখা যাচ্ছে এই শিল্পে গড় বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১১ লাখ টাকা। এর মধ্যে স্থির মূলধন ও চলতি মূলধন উভয়খাতে প্রায় সম পরিমাণ অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ৫ লাখ টাকা করে বিনিয়োগ করা হয়েছে। চলতি মূলধনের তুলনায় স্থির মূলধন বেশী না হওয়া এটা ইঙ্গিত দেয় যে, এই খাতে প্রযুক্তি সংগ্রহের জন্য বিনিয়োগ অত্যন্ত কম। ফলে এই খাত প্রযুক্তির দিক দিয়ে দুর্বল। বরং কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য এই খাত তুলনামূলকভাবে বেশী বিনিয়োগ করে।

সারণী-৪ থেকে দেখা যাচ্ছে এ শিল্পে স্থির মূলধন খাতে প্রায় ৬৮% উদ্যোক্তার বিনিয়োগই আড়াই লাখ টাকার নিচে এবং প্রায় ৮৫% উদ্যোক্তার বিনিয়োগই সাড়ে চার লাখ টাকার নিচে। প্রায় ১০% উদ্যোক্তার বিনিয়োগ সাড়ে ১২ লাখ টাকার উপরে। সাড়ে চার লাখ টাকার উপরে কিন্তু সাড়ে ১২ লাখ টাকার নিচে এমন উদ্যোক্তাদের সংখ্যা প্রায় শতকরা ৫ ভাগ। অন্যদিকে সর্বাধিক সংখ্যক উদ্যোক্তার চলতি মূলধন ১ থেকে ২ লাখ টাকার মধ্যে। শতকরা প্রায় ২৬ জন উদ্যোক্তা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কেবলমাত্র ২৭% উদ্যোক্তার বিনিয়োগ ৫ লাখ টাকার উপরে। অবশিষ্ট ৭৩% উদ্যোক্তার স্থির মূলধন ৫ লাখ টাকার কম।

সারণী-৫ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিনিয়োগের প্রায় ৯২% পারিবারিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত। অবশিষ্ট বিনিয়োগ পরিবার ও ব্যাংক উভয় সূত্র থেকে পাওয়া। এ সব কারখানার প্রায় ৮৮% নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং অবশিষ্ট অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। এসব কারখানার ব্যবস্থাপনার ধরণ মূলতঃ অপ্রাতিষ্ঠানিক। প্রায় ৮৯% কারখানা এভাবে পরিচালিত হয়। বাকী ১১% কারখানা প্রাতিষ্ঠানিক (formal) ভাবে পরিচালিত হয়। প্রায় ৮৭% কারখানা ভাড়া করা জমিতে পরিচালিত এবং অবশিষ্ট কারখানা নিজস্ব জমিতে পরিচালিত। বিপুল সংখ্যক কারখানা নিজের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হবার কারণ হচ্ছে এই পেশা তুলনামূলকভাবে নতুন এবং উদ্যোক্তারা শ্রমিক হিসেবে অনুরূপ কারখানাতে অভিজ্ঞতা লাভের পর নিজ উদ্যোগে স্বতন্ত্র কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

সারণী-৭ এ দেখা যায়, প্রায় ৩৩% কারখানায় ব্যবহৃত মেশিন উদ্যোক্তাদের নিজেদের তৈরী। স্থানীয় বাজার থেকে ৮৮% এবং বিদেশ থেকে ৬০% কারখানা মেশিন সংগ্রহ করে ব্যবহার করছে।

সারণী-৮ এ দেখা যায়, এসব কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রায় ৫৭% দক্ষ ও বাকীরা আধা-দক্ষ। প্রতিটি কারখানায় গড়ে ৬.২ জন শ্রমিক নিয়োজিত। এর মধ্যে গড়ে ৩.৮৫ জন দক্ষ শ্রমিক এবং ২.৬২ জন অদক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত। সবচেয়ে বেশী সংখ্যক কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা ৩ থেকে ৫ জন (প্রায় ৩৬%) এর মাঝে সীমিত। প্রায় ৭৯% কারখানাতেই শ্রমিকের সংখ্যা ৯ এর চেয়ে কম। কেবলমাত্র ২১% কারখানাতে শ্রমিকের সংখ্যা ৯ এর বেশী।

সারণী-৯ এ শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার স্তর দেখানো হয়েছে। প্রায় ৩৯% শ্রমিকের কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন এমন শ্রমিকের সংখ্যায় ৭৪%। দশম শ্রেণীর উপরে লেখাপড়া করেছেন এমন শ্রমিকেরা মোট শ্রম শক্তির মাত্র ২ শতাংশ। জরীপে দেখা যায়, শ্রমিকেরা কোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করেননি।

জরীপে অন্তর্ভুক্ত উদ্যোক্তারা জরীপের পূর্ববর্তী ৫ বছরে পণ্য উন্নয়নে (upgradation) সমর্থ হয়নি। উদ্যোক্তাদের প্রায় ৯৮% পণ্যের ডিজাইন সংগ্রহ

করেছে ক্রেতাদের কাছ থেকে, ১৩% সংগ্রহ করেছেন বিদেশী পণ্য দেখে এবং ১১% সমর্থ হয়েছেন নিজস্ব ডিজাইন অনুসারে। পণ্য তৈরী করতে একাধিক উত্তর (multiple response) বিবেচনা করা হয়েছে। জরীপের পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে তারা নতুন কোন পণ্য উদ্ভাবনও (fabricate) করেনি। সকল (১০০%) উদ্যোক্তাই নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে কোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়াই যন্ত্রপাতি নির্বাচন ও সংগ্রহ করেছেন। সকল উদ্যোক্তাই পণ্যের গুণগত মান পরীক্ষা করেন চোখে দেখে। এ জন্য তারা কোন যন্ত্রের সহায়তা নেন না।

৫। অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতি বিকাশের সমস্যাসমূহ

অনুকরণ প্রকৌশলে নিয়োজিত উদ্যোক্তারা বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত। এ সব সমস্যার মধ্যে বিনিয়োগ তহবিলের দুস্প্রাপ্যতা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, উপকরণ পরীক্ষণের (material testing) জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো, প্রযুক্তি বিষয়ে তথ্য ব্যবস্থা, উদ্ভাবনীর জন্য ঝুঁকি মূলধন ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠানের অভাব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। জরীপে উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তাদের উত্তরের ভিত্তিতে মূল সমস্যাগুলোকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। নিচে উদ্যোক্তারা যে সব সমস্যার কথা উল্লেখ করেন তা লিপিবদ্ধ করা হল।

(ক) কাঁচামাল সংক্রান্ত সমস্যা

(১) কাঁচামালের উচ্চ মূল্য

(২) প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সব সময় পাওয়া যায় না

(৩) কখনও কখনও কোন বিশেষ ধরনের যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ তৈরীর জন্য উচ্চমান সম্পন্ন কাঁচামাল দরকার হয়, যা স্থানীয় বাজারে পাওয়া যায় না।

(খ) মূলধন সংক্রান্ত সমস্যা

(১) ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তির প্রক্রিয়া দীর্ঘ ও জটিল

(২) অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ পাওয়া যায় না

(৩) চলতি মূলধনের দুস্প্রাপ্যতা

(৪) ব্যাংক ঋণের সুদের হার অত্যন্ত উচ্চ

(গ) উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্যা

(১) পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় সঠিক ধরনের ধাতু নির্বাচনে অক্ষমতা;

(২) দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রম শক্তির দুষ্প্রাপ্যতা;

(৩) উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অভাব

(৪) হিট ট্রিটমেন্ট (Heat-treatment) এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অনুপস্থিতি;

(৫) ড্রয়িং, ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব;

(৬) বিভিন্ন ধরনের ধাতুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অজ্ঞতা হেতু সঠিক ধরনের ধাতু নির্বাচনে অপারগতা;

(৭) শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাংলা ম্যানুয়ালের অভাব।

(ঘ) উদ্ভাবনী উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্যা

(১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অভাব;

(২) অর্থাভাবে নিজস্ব গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) ইউনিট গড়ে তুলতে না পারা;

(৩) সরকারি গবেষণা ও উন্নয়ন অবকাঠামোর অনুপস্থিতি;

(৪) বাজারের আকার অত্যন্ত সীমিত হওয়ায় গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ব্যয় উসুল করার সুযোগ না থাকা;

(৫) উদ্ভাবনীর জন্য বা ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের জন্য ঋণ বা আর্থিক সহযোগিতার অভাব;

(৬) ঝুঁকি মূলধনের (Venture capital) অভাব।

(ঙ) বিপণন সংক্রান্ত সমস্যা

(১) সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ক্রয় চুক্তির দুষ্প্রাপ্যতা;

(২) পণ্য বহুধাকরণ (diversification) এর জন্য দক্ষ শ্রমিকের অপ্রতুলতা;

(৩) বাজারের আকার অত্যন্ত সীমিত;

(৪) স্থানীয় পণ্যের উৎপাদন খরচ বিদেশী পণ্যের চেয়ে বেশী হওয়ায় বিদেশের সাথে প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়া;

(৫) অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতিতে উৎপাদিত পণ্যের অনুরূপ বা বিকল্প বিদেশী পণ্যের উপর আরোপিত শুল্ক অত্যন্ত কম হওয়ায় এসব পণ্য কর্তৃক বাজার দখল;

(৬) উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কে তথ্য প্রচারের সুযোগের অভাব।

৬। অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতি থেকে প্রযুক্তির স্থানান্তর বৃদ্ধির উপায়

ইতোমধ্যেই অনুকরণ প্রকৌশলে নিয়োজিত কারখানাগুলোর প্রকৃতি এবং এই পদ্ধতির বিকাশ ও উন্নয়নের সমস্যাবলী আলোচনা করা হয়েছে। এ সবের আলোকে নিচে এই পদ্ধতির বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে প্রযুক্তির স্থানান্তর কিভাবে বাড়ানো যায় সে সম্পর্কে নিচে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়ন করা হলঃ

১) অনুকরণ প্রকৌশলে নিয়োজিত কারখানাগুলোর জন্য অধিকতর ফিসক্যাল ও আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সরকার এসব কারখানার জন্য একটি ঝুঁকি তহবিল (venture capital fund) গঠন করতে পারেন যা থেকে উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্পের জন্য মঞ্জুরী প্রদান করা যায়। এসব কারখানার জন্য সহজ শর্তে ও কম সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া এসব কারখানাকে মূল্য সংযোজন কর (VAT) এর আওতা বহির্ভূত রাখা প্রয়োজন। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঝুঁকি তহবিল সরবরাহের জন্যও সরকার উৎসাহিত করতে পারে যাতে উদ্যোক্তগণ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে এগিয়ে আসেন।

২) এসব কারখানার উদ্ভাবিত পণ্যের ব্যাপক প্রচারের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। বিসিক ও অনুকরণ প্রকৌশলে নিয়োজিত শিল্পসমূহের সমিতি National Association for Small and Cottage Industries (NASIB/ নাসিব) এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারে। উৎপাদিত পণ্যের একটি স্থায়ী প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বিসিকের উদ্যোগ নেয়া উচিত। উৎপাদিত পণ্য সম্পর্কিত তথ্য প্রচারের জন্য একটি ওয়েব পেজ তৈরী করা যেতে পারে। বিসিক বা শিল্প মালিক সমিতি এসব কারখানার উৎপাদিত পণ্যের তালিকা সম্বলিত বই/পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশ করতে পারে।

৩) সরকারের প্রকৌশল শিক্ষায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET/বুয়েট), বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজী (বিআইটি) এবং গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন বাংলাদেশ শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR), বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরী সহায়তা কেন্দ্র (BITAC/বিটাক) প্রভৃতির সমন্বয়ে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা দরকার। এই প্রতিষ্ঠান পণ্য ও প্রসেস প্রযুক্তি নির্বাচনে ও আমদানীকৃত প্রযুক্তি থেকে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য পরামর্শ ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে। এসব কারখানায় সহযোগিতার চাহিদা ও সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের জনশক্তির দক্ষতার উপর ভিত্তি করে এই প্রতিষ্ঠানটি কি ধরনের সেবা প্রদান করবে তা নির্ধারণ করতে হবে।

৪) এসব কারখানাকে পণ্যের বাজার (দেশীয় ও বিদেশী) ও প্রযুক্তির উৎস সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। এ ব্যাপারে বিসিককে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫) উদ্যোক্তাদেরকে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ও বাণিজ্য মেলা দেখার জন্য বা এতে তাদের উৎপাদিত পণ্য উপস্থাপনের জন্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা উচিত। উদ্যোক্তাদের নমুনা পণ্য বা মেশিন সহজ শর্তে করমুক্ত অবস্থায় আমদানীর সুযোগ দেয়া উচিত।

৬) এসব কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের দক্ষতার স্তর উন্নত করার জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন। বিসিক এবং নাসিব শ্রমিক ও উদ্যোক্তাদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করতে পারে। বিসিক এজন্য একটি তহবিল গঠন করতে পারে। বুয়েট ও বিআইটিসমূহও প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করতে পারে।

৭) উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান নির্ভর করে কাঁচামালের গুণগত মানের উপর। কিন্তু দেশে কাঁচামালের গুণগত মান পরীক্ষার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর অভাব এবং এসব অবকাঠামোর প্রাপ্যতা সম্পর্কে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আছে। বিসিক ও নাসিব এসব অবকাঠামোর অবস্থান সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের অবহিত করতে পারে। বুয়েট, বিটাক ও বিএসটিআই-এর

পরীক্ষাগার সুলভ মূল্যে এসব উদ্যোক্তাদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা প্রয়োজন। এ ছাড়াও বিসিক, বিটাক, নাসিব এর সাথে যৌথভাবে পরীক্ষাগার স্থাপনে উদ্যোগ নিতে পারে।

৮) পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কঠোরভাবে আরোপ করা হলে তা এর গুণাগত মান ক্রমাগতভাবে উন্নত করবে। বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেষ্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI/ বিএসটিআই) যে সব পণ্যের সনদ প্রদান করেছে সে সব পণ্য প্রদত্ত সনদ অনুসারে গুণগত মান রক্ষা করে উৎপাদিত হচ্ছে কিনা তা কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এভাবে পণ্যের মান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা অর্জন করা সম্ভব। বিএসটিআই-এর পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমকে শক্তিশালী করেও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও প্রযুক্তির স্থানান্তর বাড়ানো সম্ভব।

৯) অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতিতে নিয়োজিত কারখানাসমূহের উৎপাদিত পণ্যের বাজার তৈরী করার জন্য সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহকে এসব কারখানা থেকে যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ ক্রয় করা উৎসাহিত করা উচিত। এতে এসব কারখানার বিপণন সমস্যা দূর হওয়ার সাথে সাথে এরা সরকারি খাতের শিল্প-কারখানাগুলোর কাছ থেকে প্রযুক্তি শেখার সুযোগ লাভ করবে। যদি ক্রেতা শিল্প প্রয়োজনীয় পণ্যের ডিজাইন প্রদান করে, কাঁচামাল সম্পর্কে পরামর্শ দেয় এবং কাঙ্খিত মান সম্পন্ন পণ্য সরবরাহ করার জন্য শর্ত আরোপ করে তবে অনুকরণ প্রকৌশলে নিয়োজিত শিল্পসমূহের প্রযুক্তি শেখা আরও ত্বরান্বিত হবে।

১০) বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও অনুকরণ প্রকৌশলে নিয়োজিত শিল্পের মধ্যে আন্ত:সংযোগ শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এর ফলে কোন একটি পণ্যের উন্নত সংস্করণ উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠান দু'টির সহযোগিতা লাভ করা সম্ভব হবে। এই আন্ত:সংযোগের ফলে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় কোন প্রযুক্তির উন্নত সংস্করণ উদ্ভাবনে সমর্থ হবে যা অনুকরণ প্রকৌশলে নিয়োজিত শিল্পসমূহ বাণিজ্যিকীকরণের সুযোগ পাবে।

১১) একটি প্রযুক্তি হস্তান্তর কেন্দ্র (Technology Transfer Centre) প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এই কেন্দ্র প্যাটেন্টের সময়কাল অতিক্রান্ত হয়েছে এরূপ প্রযুক্তি নির্বাচন করতে পারে যার অনুকরণে কোন আইনগত বাধা নেই। এছাড়াও আমাদের পক্ষে যে সব প্রযুক্তি অনুকরণ করে উন্নত সংস্করণ তৈরী করা সম্ভব এই কেন্দ্র সে সব প্রযুক্তি নির্বাচন করতে পারে এবং এদের প্রাপ্যতা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করতে পারে।

১২) অনুকরণ শিল্পে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ শিল্প এলাকা স্থাপন করা যেতে পারে।

১৩) প্রযুক্তি উদ্ভাবনের স্বীকৃতিস্বরূপ আর্থিকভাবে উদ্যোক্তাদের পুরস্কৃত করা উচিত।

১৪) বিশেষজ্ঞ পরামর্শ কেন্দ্র (Expert Consultation Centre), সার্ভিস সেন্টার ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে অনুকরণ প্রকৌশলে নিয়োজিত শিল্পসমূহকে উপদেষ্টা ও কারিগরী সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত। এ সব সেন্টার থেকে নির্দিষ্ট ফি প্রদানের মাধ্যমে এ সব শিল্প (ড্রয়িং, ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন, কাঁচামাল সনাক্তকরণ, কাঁচামাল ও পণ্যের গুণগত মান নির্ধারণ, ইত্যাদি বিষয়ে) বিভিন্ন ধরনের কারিগরী সহায়তা নিতে পারে যা এদের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষমতার বিকাশ ঘটাবে।

১৫) একটি প্রযুক্তি উন্নয়ন (Technology Development) ব্যাংক স্থাপন করে এই ব্যাংক থেকে এসব শিল্পে বিনিয়োগ ও নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য কম সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়শীল দেশে প্রযুক্তি স্থানান্তরে বাজার শক্তির (market forces) ভুমিকা যথেষ্ট নয়। কারণ সীমিত চাহিদার কারণে বাজারের আয়তন সীমিত এবং শিল্প-কারখানাগুলোর পক্ষে গবেষণা ও উন্নয়নে অর্থ ব্যয় করে প্রযুক্তি উন্নয়ন বা অর্থ বিনিয়োগ করে নতুন প্রযুক্তি ক্রয় করা কষ্টকর। এমতাবস্থায় দেখে শিখে প্রযুক্তি তৈরীর ক্ষমতা অর্জন বা প্রযুক্তির অধিকতর উন্নয়ন ও পরিবর্তন সম্ভবপর হলে তা দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর হবে এবং প্রযুক্তি সংগ্রহের ব্যয় কমবে। এজন্য সরকারের অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষকতা করা প্রয়োজন। তবে প্রযুক্তি তৈরী বা উন্নয়নের ক্ষমতা অর্জনে যথেষ্ট অগ্রগতি হলে

সরকারের ভূমিকা সীমিত করা যেতে পারে এবং প্রযুক্তি স্থানান্তরের বিষয়টি বাজার শক্তির উপর ছেড়ে দেয়া যেতে পারে।

তবে অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতিতে প্রযুক্তি স্থানান্তরের ক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে কিছুটা নির্বাচনমুখী (selective) হওয়া প্রয়োজন। যে সব প্রযুক্তির মেধা স্বত্ব প্যাটেন্টের মাধ্যমে সংরক্ষিত সে সব প্রযুক্তি অনুকরণ প্রকৌশলের মাধ্যমে তৈরীর উদ্যোগকে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত হবে না। বরং যে সব প্রযুক্তির প্যাটেন্টের মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে সে সব প্রযুক্তি অনুকরণ প্রকৌশলের মাধ্যমে আয়ত্ব করার ব্যাপারে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এরূপ প্রযুক্তি নির্বাচনের দায়িত্ব সরকার প্রযুক্তি হস্তান্তর কেন্দ্রের উপর অর্পণ করতে পারে। এরূপ প্রযুক্তি আয়ত্ব করার মাধ্যমেও দেশে প্রযুক্তি উন্নয়ন ও উদ্ভাবন ক্ষমতার বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব ও দেশে প্রযুক্তির স্থানান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব। বিশেষত আগামী ২০০৪ সালের পরে যেহেতু উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রযুক্তির মেধাস্বত্ত্ব কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে এবং প্যাটেন্ট লংঘন করে প্রযুক্তি অনুকরণ করার কোন সুযোগ আর থাকবেনা, কাজেই কেবলমাত্র প্যাটেন্টকাল অতিক্রম করেছে এরূপ প্রযুক্তিই বাছাই ও অনুকরণ করে প্রযুক্তি উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে।

৭। উপসংহার

দেশে প্রযুক্তির চাহিদা পূরণে অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। এই পদ্ধতিতে অনুকরণরত শিল্প-কারখানাগুলো প্রথম ধাপে একটি পণ্য বা যন্ত্র দেখে অনুরূপ পণ্য বা যন্ত্র তৈরী করার দক্ষতা অর্জন করে। দ্বিতীয় ধাপে পণ্যটির উন্নত সংস্করণ উদ্ভাবনে সমর্থ হয়। কাজেই এই পদ্ধতি বিশ্বের বেশ কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ক্ষমতা আয়ত্ব করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু আমাদের দেশে এই পদ্ধতির তেমন একটা বিকাশ ও উন্নয়ন ঘটেনি। এ কারণে দেশের অনুকরণ প্রকৌশল শিল্পগুলোর অনুকরণের মাধ্যমে একটি পণ্যের উন্নত সংস্করণ তৈরী করার ক্ষমতা অর্জনের বিষয়টি এখনও সুদূর পরাহত। দেশে এ পেশায় নিয়োজিত উদ্যোক্তারা কোন একটি পণ্য দেখে অনুরূপ একটি পণ্য তৈরী করতে পারলেও তা গুণগত মানের দিক দিয়ে আসল পণ্যের

চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট থেকে যায়। এর কারণ হচ্ছে আসল পণ্যের ড্রয়িং, ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং কাঁচামাল ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এদের জ্ঞানের অভাব। ফলে এরা অনুকরণ প্রকৌশলের প্রাথমিক ধাপ থেকে পরবর্তী ধাপে উন্নীত হতে পারছেনা এবং দেশও বঞ্চিত হচেছ এই পদ্ধতির সুফল থেকে। দেশে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারকদের নিকট এই পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা না থাকায় এই পদ্ধতিতে নিয়োজিত উদ্যোক্তারা কোন সরকারি সহযোগিতা পান না। ফলে, দেশে এই পদ্ধতি থেকে সুফল প্রাপ্তির কোন সুযোগ তৈরী হয়নি এবং এই পদ্ধতি প্রযুক্তির চাহিদা পূরণে কোন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেনি। কিন্তু অনুকরণ প্রকৌশল পদ্ধতির বিকাশ ও উন্নয়নে যথাযথ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিত করতে পারলে অমিত সম্ভাবনাময় এই পদ্ধতি দেশে প্রযুক্তির চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সমর্থ হবে। অন্যথায় দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ আমাদের অজ্ঞতায় ও অবহেলায় নষ্ট হয়ে যাবে।

পরিশিষ্ট

সারণী-১ঃ জরীপে অন্তর্ভুক্ত উদ্যোক্তাদের এলাকাভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস।

	এলাকা	উদ্যোক্তার সংখ্যা	মোট উদ্যোক্তার শতকরা অংশ
১।	ধোলাইখাল ও সংলগ্ন এলাকা	৩১	২৫.৬২
২।	জিনজিরা	১৬	১৩.২২
৩।	সায়েদাবাদ	৮	৬.৬১
৪।	জুরাইন	১০	৮.২৬
৫।	পোস্তাগোলা	৫	৪.১৪
৬।	গাবতলী ও মীরপুর	১৮	১৪.৮৭
৭।	মহাখালী	৬	৪.৯৬
৮।	তেজগাঁও	৮	৬.৬১
৯।	ফার্মগেট ও মোহাম্মদপুর	৮	৬.৬১
১০।	রামপুরা ও খিলগাঁও	৬	৪.৯৬
১১।	বকশীবাজার	৫	৪.১৪
মোট		১২১	১০০.০০

সারণী-২ঃ নির্বাচিত চলকসমূহের গড় ও পরিমিত ব্যবধান (Standard deviation)।

চলক (একক)	গড়	পরিমিত ব্যবধান
উদ্যোক্তাদের বয়স (বৎসর)	৩৯.৮৮	১০.৬৮
উদ্যোক্তাদের শিক্ষা (বৎসর)	৭.৭৭	৩.৭৭
উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা (বৎসর)	১০.০৯	৭.৬২
মোট বিনিয়োগ (লাখ টাকা)	১০.৮৭	১৩.২২
স্থির মূলধন (লাখ টাকা)	৫.৪৪	৯.৭৫
চলতি মূলধন (লাখ টাকা)	৫.৪৩	৮.৯৬
শ্রমিকের সংখ্যা (ইউনিট প্রতি)	৬.২০	৫.৮২
দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা (ইউনিট প্রতি)	৩.৫৮	২.২৯
আধা দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা (ইউনিট প্রতি)	২.৬২	৩.৬৪

সারণী-৩ ঃ বয়স ও শিক্ষা অনুসারে জরীপে অন্তর্ভুক্ত উদ্যোক্তাদের শ্রেণী বিন্যাস।

বয়স			শিক্ষা		
বয়সের শ্রেণী	সংখ্যা	শতকরা হার	শিক্ষার স্তর	সংখ্যা	শতকরা হার
২০-৩০	২৬	২১.৪৯	প্রাথমিক স্তরের নিচে	৫	০.৮৩
৩১-৪০	৪৪	৩৬.৩৬	প্রাথমিক	৬৮	৫৬.২০
৪১-৫০	৩৩	২৭.২৭	এস,এস,সি, পাশ	২০	১৬.৫৩
৫০+	১৮	১৪.৮৮	এইচ,এস, সি, পাশ	১৭	১৪.০৫
			তদূর্ধ	১১	৯.০৯
সকল শ্রেণী	১২১	১০০.০০	সকল শ্রেণী	১২১	১০০.০০

সারণী-৪ ঃ অনুকরণ প্রকৌশলে নিয়োজিত কারখানায় বিনিয়োগের ধরণ (স্থির মূলধন)।

বিনিয়োগের পরিসর (হাজার টাকা)	কারখানার সংখ্যা	শতকরা হার
৫০ এর নিচে	১৬	১৩.২২
৫০-২৪৯	৬৬	৫৪.৫৪
২৫০-৪৪৯	২১	১৭.৩৬
৪৫০-৮৪৯	২	১.৬৫
৬৫০-৬৪৯	৩	২.৪৮
৮৫০-১০৪৯	১	০.৮৩
১০৫০-১২৪৯	০	০
১২৫০-১৫০০	২	১.৬৫
১৫০০+	১০	৮.২৬
মোট	১২১	১০০.০০

সারণী-৫ঃ অনুকরণ প্রকৌশলে নিয়োজিত কারখানায় বিনিয়োগের ধরণ (চলতি মূলধন)।

বিনিয়োগের পরিসর (হাজার টাকা)	কারখানার সংখ্যা	শতকরা হার
৫০ এর নীচে	৬	৪.৯৬
৫০-১০০	৮	৬.৬১
১০১-২০০	৩২	২৬.৪৫
২০১-৩০০	১৪	১১.৫৬
৩০১-৫০০	২৮	২৩.১৪
৫০১-৭০০	১২	৯.৯২
৭০১-১০০০	৯	৭.৪৪
১০০০ এর উপরে	১২	৯.৯২
মোট	১২১	১০০.০০

সারণী-৬ ঃ **কারখানা ও মূলধনের উৎস এবং ব্যবস্থাপনার ধরণ।**

বিষয়	কারখানার সংখ্যা	শতকরা হার	বিষয়	কারখানার সংখ্যা	শতকরা হার
কারখানার উৎস			**ব্যবস্থাপনার ধরণ**		
উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত	১৫	১২.৪০	প্রাতিষ্ঠানিক	১৩	১০.৭৩
নিজের প্রতিষ্ঠিত	১০৬	৮৭.৬০	অপ্রাতিষ্ঠানিক	১০৮	৮৯.২৭
মুলধনের উৎস			কারখানার জমি		
পরিবার	১১১	৯১.৭৪	নিজস্ব	১৬	১৩.২৩
পরিবার ও ব্যাংক	১০	৮.২৬	ভাড়া করা	১০৫	৮৬.৭৭

সারণী-৭ ঃ কারখানায় ব্যবহৃত মেশিনের উৎস।

উৎস	কারখানার সংখ্যা	শতকরা হার
নিজের তৈরী	৪০	৩৩.০৬
স্থানীয় বাজার থেকে কেনা	১০৭	৮৮.২৩
আমদানীকৃত	৭৩	৬০.৩৩

দ্রষ্টব্য ঃ একাধিক (multiple) উত্তর গণনা করা হয়েছে।

সারণী-৮ ঃ জরীপকৃত কারখানায় নিয়োগের ধরণ ও শ্রমিকদের দক্ষতার স্তর।

শ্রমিকের সংখ্যা	কারখানার সংখ্যা	শতকরা হার	দক্ষতার স্তর	শ্রমিকদের সংখ্যা	মোট শ্রমিকের শতকরা হার
১-২	২৯	২৩.৯৭	দক্ষ	৪১৪	৫৭.০২
৩-৫	৪৩	৩৫.৫৩	আধা দক্ষ	৩১২	৪২.৯৮
৬-৮	২৩	১৯.০১			
৯+	২৬	২১.৪৯			
সকল শ্রেণী	১২১	১০০.০০	মোট	৭২৬	১০০.০০

সারণী-৯ ঃ শিক্ষার স্তর অনুযায়ী শ্রমিকদের শ্রেণী বিন্যাস।

শিক্ষার স্তর	শ্রমিকদের সংখ্যা	শতকরা হার
প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই	২৮০	৩৮.৫৭
৫ম শ্রেণী পর্যন্ত	৩৪১	৪৬.৯৭
দশম শ্রেণী পর্যন্ত	৯০	১২.০৮
দশম শ্রেণীর উর্দ্ধে	১৫	২.০৮
মোট	৭২৬	১০০.০০

তথ্য নির্দেশিকা

Drucker, P. F., (1985), ***Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles,*** Heinemann, London.

Haque, M. Mainul, (1989), **A Method for Promoting Indigenous Innovations, *Science and Public Policy*,** 16(1): 37-45

Haque, M. Mainul, (1989), **Promotion of Indigenous Innovations in the Non-farm Sector for Sustained Rural Development, *Science and Public Policy*,** 16(5): 299-306

Haque, M. Mainul, (1989), **Development of Entrepreneurs to Achieve Technology Transfer,** *Bangladesh Journal of Political Economy*, 12(2): 425-431

Haque, M. Mainul, (1998), **Management and Organisation of Reverse Engineering,** a paper presented in *`Workshop on Reverse Engineering'* organized by Institute of Appropriate Technology, Bangladesh University of Engineering &Technology (BUET) Dhaka, in June 1998.

Islam, M. Nazrul, (1998), **Technological Aspects of Reverse Engineering,** a paper presented in *`Workshop on Reverse Engineering'* organized by Institute of Appropriate Technology, BUET, Dhaka in June 1998.

Islam, M. Nurul, (1998), **Reverse Engineering in Bangladesh,** a paper presented in *`Workshop on Reverse Engineering'* organized by Institute of Appropriate Technology, BUET, in June 1998.

Khan A.U., (1985), **Industrial Entrepreneurship in Dhaka City: Modeling the Decision-Making Process,** *Oriental Geographer*, 29-30 (1&2). Reprinted in Islam, N., (ed.) (1996), Urban Bangladesh: Geographical Studies, Published by Department of Geography, University of Dhaka, Pages 121-141.

Khuda, Zinatunnesa, R.M.M, and Nizamuddin, K., (1987), **Industrial Prospect of the Dholaikhal Area in Dhaka City,** *Oriental Geographer*, 31(1&2). Reprinted in Islam, N., (ed.) (1996), Urban Bangladesh: Geographical Studies, Published by Department of Geography, University of Dhaka, Pages 142-155.

Uddin, M. K., (1999), **Reverse Engineering: A Promise for Harnessing Sustainable Technological Development in Bangladesh,** BIIS Journal, 20(4): 488-523

ISSN 1605-2021

লোক প্রশাসন সাময়িকী
দ্বাবিংশতিতম সংখ্যা,
মার্চ ২০০২/চৈত্র ১৪০৮

ঘূর্ণাবর্তে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কতিপয় সাম্প্রতিক বিতর্ক

আনোয়ার পাশা *

Local Government in Bangladesh Recent Controversy

Anowar Pasa

Abstract: *National governance in Bangladesh is highly centralized and elitist. In such a polity, Local Government Institutions (LGIs) are to play their vital roles to supply goods and services as well as the necessary inputs to the rural people effectively. But in Bangladesh, local government and other decentralized and participatory institutions have not been developed as relatively self-governing autonomous people's institutions. The civil and military governments have used the overall local government system to civilianize their military regimes and / or to build favorable networks of their supporters at grass roots. Hence, the Bangladesh local government system remained as one of the burning issues. There is a consensus among all concerned quarters about the need for strengthening local government and make it self-governing in the real sense. However, there are differences of opinions and also different solutions as to how to make it self-propelled. Against this backdrop, this article attempts to analyze the real local government scenario of the country; to articulate the cross-currents of opinions regarding local government system of the country; to justify the merits and demerits of different opinions; and finally to find a sustainable way out of the crisis through evolving a New Local Government System (NLGS).*

* সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

ঘূর্ণাবর্তে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কতিপয় সাম্প্রতিক বিতর্ক
আনোয়ার পাশা

ভূমিকা ঃ

আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনে রাষ্ট্রকে পুলিশী রাষ্ট্র হিসেবে নয় বরং জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। সুতরাং নাগরিকদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রকে বহুবিধ কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। এ গুলোর মধ্যে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, রাস্তা-ঘাট মেরামত, স্থানীয় হাট-বাজার পরিদর্শন ইত্যাদির মত বিশেষ কিছু কার্যাবলী রয়েছে, রাজধানীতে বসে কোন সরকারের পক্ষে যেগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সহজসাধ্য নয়। এখান থেকেই স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা উদ্ভুত হয়। অতএব, আধুনিককালে সভ্য রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকই জাতীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার এ দু'টি কর্তৃত্বের অধীনে বসবাস করেন। এ দু'টি পৃথক কর্তৃত্ব সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংবিধানিক কিংবা আইনগত নির্দেশনা থাকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘‘রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করিবেন ...’’ (অনুচ্ছেদ ৯ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান)। রাষ্ট্র কর্তৃক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে উৎসাহ দান করার কথা সংবিধানে ব্যক্ত করা হলেও স্থানীয় সরকার বিষয়ে সংবিধানে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা নেই। ফলে যখন যে সরকার ক্ষমতাসীন হন সে সরকার নিজের মত করেই স্থানীয় সরকার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন এবং স্থানীয় সরকার বিষয়ে ব্যাপক সংস্কার সাধনের নামে ব্যাপক হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেন। এ সকল সংস্কার বা হস্তক্ষেপকে ঘিরে সরকার, রাজনীতিবিদ, একাডেমিক সার্কেল, উন্নয়ন সহযোগী সকল পক্ষের মনেই কিছু জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়; এবং জিজ্ঞাসার সূত্র ধরে তারা এ বিষয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। বর্তমানেও দেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে এ জাতীয় একটি বিতর্ক চলমান রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে চলমান এই বিতর্কের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস থাকবে। প্রবন্ধের শেষাংশে উন্নয়ন প্রেক্ষিতে দেশের জন্য কল্যাণকর হয়ে উঠতে পারে এমন একটি বিকল্প স্থানীয় সরকার কাঠামো সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

স্থানীয় সরকার

সাধারণ অর্থে স্থানীয় সরকার বলতে একটি ভূ-খন্ডগত অসার্বভৌম সম্প্রদায় বুঝায় যাদের নিজস্ব বিষয় নিয়ন্ত্রণ করার মত প্রয়োজনীয় আইনগত অধিকার ও সংগঠন আছে। তবে, সামাজিক বিজ্ঞানের অপরাপর বিষয়সমূহের ন্যায়

স্থানীয় সরকারের সংজ্ঞা বিষয়েও পন্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোন সাধারণ ঐকমত্য নেই। স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা স্থানীয় সরকার প্রত্যয়টিকে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। সামাজিক বিজ্ঞান কোষে স্থানীয় সরকার অর্থে বলা হয়েছে, ''এটি একটি সংগঠন - যা কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারের কোন একটি ক্ষুদ্র এলাকায় সীমিত পরিমাণে দায়িত্ব পালন করে'' (International Encyclopaedia of Social Sciences, 1960: 451)। ভৌগলিক সীমারেখা এবং দায়িত্বের সীমিত পরিসরের ইঙ্গিত ছাড়া সংজ্ঞাটিতে স্থানীয় সরকার বিষয়ক সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য নেই। আবার, ডন লকার্ড (Duane Lockard) স্থানীয় সরকার অর্থে আঞ্চলিক বা জাতীয় সরকারের পরিধিভুক্ত তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ডের মধ্যে সীমিত পরিসরে জননীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংগঠনকে বুঝিয়েছেন। লকার্ড এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, সরকারি সংস্থাসমূহের পিরামিডের নিম্নভাগে স্থানীয় সরকার; শিখরে জাতীয় সরকার; এবং মধ্যভাগে প্রদেশ, অঞ্চল, রাজ্য ইত্যাদির অবস্থান (Siddiqui, 1995: 3-4)। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারকে জাতীয় সরকারের অংশ হিসেবে দেখিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারেরই প্রসারিত হস্তবিশেষ। বলা বাহুল্য, স্থানীয় সরকারের গণতান্ত্রিক চরিত্রের সঙ্গে সংজ্ঞাটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। জাতিসংঘ প্রণীত সংজ্ঞায় স্থানীয় সরকারের একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে, ''স্থানীয় সরকার কোন জাতি বা রাষ্ট্রের এমন একটি উপ-বিভাগ (subdivision)-কে বুঝায় যেটি আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে করারোপ কিংবা শ্রম আদায়সহ স্থানীয় বিষয়াদির উপর যার সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এ জাতীয় স্বত্তার নিবহী পরিষদটি নির্বাচিত হতে পারে কিংবা স্থানীয়ভাবে মনোনীতও হতে পারে'' (Alderfer, 1964:178) । এ সংজ্ঞাটি স্পষ্টতর হলেও স্থানীয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শাসন ছাড়াও মনোনয়ন পদ্ধতিতে গঠিত পরিষদকে এখানে স্থানীয় সরকারের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, চার্লস ব্যারই (Charles Barratt) প্রদত্ত সংজ্ঞায় স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ কারণে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে চার্লস ব্যারই প্রদত্ত সংজ্ঞাটি বাস্তবের সঙ্গে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। তাঁর মতে, স্থানীয় সরকার বলতে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত এমন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝায় যাদের দায়িত্বাবলী নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখায় সীমাবদ্ধ থাকে; দায়িত্বাবলী পালনের নিমিত্ত নিজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে স্থানীয় কর ধার্য করতে পারে; যদিও জাতীয় সরকার জনস্বার্থে এই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করে, তথাপি তারা জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করে বা জাতীয় সরকারের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে (করিম : ১৯৯১) ।

'স্থানীয় সরকার' ও 'স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার'

উপর্যুক্ত প্রত্যয় দু'টি অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও এ দু'য়ের মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যবধান ও পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে 'স্থানীয় সরকার' ও 'স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার' প্রত্যয় দু'টির পার্থক্য নির্দেশের প্রয়াস থাকবে:

প্রথমতঃ স্থানীয় সরকার হল রাষ্ট্রের ভৌগলিক এলাকাকে বিভক্ত করে ক্ষুদ্রতর পরিসরে প্রতিষ্ঠিত সরকার ব্যবস্থা। এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসেবে বিভাগ, জেলা, ও থানা'র নাম উল্লেখ করা যায়। পক্ষান্তরে, স্থানীয় প্রয়োজন মেটাবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় প্রতিষ্ঠিত এবং আইনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা হ'ল স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার। উদাহরণ হিসেবে জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ এজেন্ট। এর স্বাধীন অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব নেই। স্থানীয় সরকারকে মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রসারিত হস্তরূপে চিহ্নিত করা যায়। পক্ষান্তরে, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের স্বাধীন স্বত্তা ও নিজস্ব গন্ডীর মধ্যে নীতি নির্ধারণের কর্তৃত্ব রয়েছে।

তৃতীয়তঃ স্থানীয় সরকার ক্ষমতা বিভাজনের (Deconcentration of power) ফলে জন্মলাভ করে; অন্যদিকে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের (Decentralization of power) মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার বিকাশ লাভ করে।

চতুর্থতঃ স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে নিজস্ব অর্থ সংস্থান ও নির্বাচিত প্রতিনিধি ব্যবস্থার অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের অন্যতম মৌলিক পূর্বশর্তই হ'ল প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা এবং নিজস্ব অর্থ সংস্থানের ক্ষমতা। যেহেতু সাধারণ্যে 'Local Government' অর্থে 'স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার' প্রত্যয়টি জনপ্রিয় এবং গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গেও বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সেহেতু বর্তমান আলোচনায় 'স্থানীয় সরকার' অর্থে 'স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার' বুঝানো হয়েছে।

স্থানীয় সরকারের যে বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে সে সকল বিষয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত

গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে বর্তমান নিবন্ধে আলোকপাত করা হবে। বিষয়গুলো হল:

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা;

২. স্থানীয় সরকারের স্তর সংখ্যা;

৩. উপজেলা পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন;

৪. স্থানীয় সরকারের উপ-স্তর; এবং

৫. উপজেলা পরিষদে জাতীয় সংসদ সদস্যের ভূমিকা।

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে গৃহীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মূল সংবিধানের 'মূলনীতি' অংশের ১১ বিধিতে বলা হয়েছে ''...এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।'' রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে এটি একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা। 'স্থানীয় শাসন' ভাগে সংবিধানের ৫৯ সংখ্যক অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক একাংশের' স্থানীয় শাসনের ভার আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে প্রদান করা হবে। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে যে সংবিধান রচিত হয়েছিল তাতে 'স্থানীয় সরকার' বা 'স্থানীয় শাসন' বিষয়ে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ও বিধান ছিল (মোরশেদ ২০০২ : ৬)। দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং নীতি নির্ধারকগণও একই মত পোষণ করেন। প্রকৃতপক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বাংলা অংশে 'স্থানীয় সরকার' নামক কোন শব্দগুচ্ছই নেই। বরং সংবিধানে 'প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক একাংশের স্থানীয় শাসন' কথাগুলো বর্ণিত রয়েছে। আবার সংবিধানের ১৫২ সংখ্যক অনুচ্ছেদে 'প্রশাসনিক একাংশ' শব্দগুচ্ছের ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হয়েছে, 'প্রশাসনিক একাংশ' অর্থ জেলা কিংবা এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা অভিহিত অন্য কোন এলাকা। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। ৫৯ অনুচ্ছেদেও স্পষ্ট কিছু বর্ণিত নেই। সুতরাং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং নীতি প্রণেতাগণ যা-ই বিশ্বাস করুন না কেন, বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার অন্যতম মৌলিক পূর্বশর্তই হ'ল, সর্বাগ্রে স্থানীয় সরকারের সাংবিধানিক ভিত্তি সুদৃঢ় করা; এবং এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট করা

যে, কোন্ কোন্ প্রশাসনিক একাংশ স্থানীয় সরকার হিসেবে গণ্য হবে; কোন্ কোন্‌টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান না হয়ে মাঠ প্রশাসনের অংশবিশেষ হিসেবে বহাল থাকবে। স্থানীয় সরকারের কোন্ কোন্ স্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবেন তাও সুস্পষ্ট করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ প্রতিটি প্রশাসনিক এককে নির্বাচিত 'স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান' প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক বিধিটিও ত্রুটিপূর্ণ। কেননা, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'প্রশাসনিক একাংশ' কিংবা 'স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান' শব্দগুচ্ছ দু'টির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সংবিধানে নেই। সুতরাং দেশে প্রশাসনিক একক কয়টি ও কী কী সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। বর্তমানে গ্রাম, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, এবং বিভাগ এ ছয়টি এককে দেশের সাধারণ প্রশাসন ব্যবস্থা বিভক্ত। কিন্তু এ ছয় স্তরের বিভাগ, গ্রাম, এবং ওয়ার্ডে কোন নির্বাচিত স্থানীয় সরকার নেই। আবার, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন সংবিধান অনুযায়ী স্থানীয় সরকার না হলেও সেগুলোর ক্ষেত্রে নির্বাচিত পরিষদ রয়েছে। এভাবে দেখা যায় যে, সংবিধানের ৯, ১১, ৫৯ ও ৬০ এই কয়টি অনুচ্ছেদের সাথে দেশের প্রচলিত স্থানীয় সরকার আইন ও ব্যবস্থা মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই পুরো ব্যবস্থাটি বিবেচনা করে সংবিধানে নতুন বিধান আনয়ন বা পুরনো বিধানের সংশোধন প্রয়োজন। সংসদে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুবাদে বর্তমান সরকারের জন্য এ কাজটি কঠিন হবার কথা নয়; বরং এ জন্য সরকারের সদিচ্ছাই যথেষ্ট।

২. স্থানীয় সরকারের স্তর সংখ্যা

এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসিত ছোট রাষ্ট্র বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের স্তর সংখ্যা নিয়ে বিগত তিন দশকে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিতর্ক হয়েছে, এবং সে বিতর্ক এখনও চলমান রয়েছে। ১৯৭১-১৯৭৫ কাল পর্বে প্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে গ্রামীণ স্থানীয় সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক স্তর ছিল তিনটি। যথা: ইউনিয়ন পর্যায়ে - ইউনিয়ন পঞ্চায়েত / পরিষদ; থানা পর্যায়ে - থানা উন্নয়ন কমিটি; এবং জেলা পর্যায়ে - জেলা বোর্ড। ১৯৭৬-১৯৮২ মেয়াদে প্রথম বিএনপি সরকারের শাসনামলেও স্থানীয় সরকারের তিনটি স্তর ছিল । যথা: ইউনিয়ন পর্যায়ে - ইউনিয়ন পরিষদ; থানা পর্যায়ে - থানা উন্নয়ন কমিটি; এবং জেলা পর্যায়ে - জেলা পরিষদ। ১৯৮২-১৯৯০ মেয়াদে জাতীয় পার্টির শাসনামলেও স্থানীয় সরকারের স্তর ছিল তিনটি। যথা: ইউনিয়ন পর্যায়ে - ইউনিয়ন পরিষদ; থানা পর্যায়ে - উপজেলা পরিষদ; এবং জেলা পর্যায়ে - জেলা পরিষদ। ১৯৯১-১৯৯৬

মেয়াদে দ্বিতীয় বিএনপি সরকার পূর্ববর্তী সরকারের হাতে সৃষ্ট জনপ্রিয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান উপজেলা পরিষদ বিলুপ্ত করে দেন। ফলে এ সময়পর্বে স্থানীয় সরকারের স্তর ছিল দ'ুটি । যথা: ইউনিয়ন পর্যায়ে - ইউনিয়ন পরিষদ; এবং জেলা পর্যায়ে - জেলা পরিষদ। স্থানীয় সরকারের স্তর সংখ্যার এ রকম নিয়মিত হ্রাস-বৃদ্ধির অন্তরালে শাসক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক স্বার্থ সর্বদাই ক্রিয়াশীল ছিল এবং রয়েছে। একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ লিখেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার তিরিশ বছর হতে চলেছে। এই সময়কালে এ দেশে স্থানীয় সরকার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কম হয়নি। যখনই যে সরকার এসেছে তারা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে একটি স্থায়ী ও শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার কথা বলেছে। আর এই কথা বলেই পূর্ববর্তী সরকারের অনুসৃত স্থানীয় সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন করেছে। নতুন ব্যবস্থা চালু করেছে। আবার সেই ব্যবস্থা বাতিল হয়েছে। স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে এই উথাল-পাতাল পরিবর্তনের ফলে এ দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কোনও শেকড় নিতে পারেনি (মেনন : ২০০১)। ১৯৯৬-২০০১ কালপর্বে স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল দেশে চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংবলিত আইন প্রণয়ন। এ চার স্তর হ'ল: গ্রাম পর্যায়ে - গ্রাম পরিষদ; ইউনিয়ন পর্যায়ে - ইউনিয়ন পরিষদ; উপজেলা পর্যায়ে - উপজেলা পরিষদ; এবং জেলা পর্যায়ে - জেলা পরিষদ। তবে, শেখ হাসিনার শাসনামলে নতুন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। ফলতঃ অক্টোবর ২০০১ এর সাধারণ নির্বাচনে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অন্যতম প্রধান নির্বাচনী ইস্যুতে পরিণত হয়। প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে এই চার স্তরের স্থানীয় সরকারের অঙ্গীকার করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিএনপি সরকার এখন চার স্তরের স্থানীয় সরকার আইন বাস্তবায়ন করবেন বলে জনগণ আশা করেন (জাহাঙ্গীর ২০০২খ : ৫)। সরকার এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য একটি 'মন্ত্রিসভা কমিটি'ও গঠন করেছেন। সে কমিটির ভেতরকার ব্যাপক মতভেদের কথাও ইতোমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। কমিটির একাংশের অভিমত ''ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া প্রশাসন গতিশীল হবেনা, উন্নয়নও ব্যাহত হবে।'' আর একাংশের অভিমত ''উপজেলা ব্যবস্থা সংসদীয় পদ্ধতির সরকারে জটিলতা সৃষ্টি করবে'' (মাশরাফী ২০০২খ : ৫)। স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটির অধিকাংশ সদস্যসহ শাসকদলের মূল নেতৃত্ব উপজেলা পরিষদসহ চার স্তরের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার পক্ষে রয়েছেন বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে, এ ক্ষেত্রে গ্রাম পরিষদের পরিবর্তে 'গ্রাম সরকার' পুনঃপ্রবর্তনের ব্যাপারেই তাঁরা বেশী আগ্রহী।

অনুমান করা যায় যে, স্থানীয় সরকারের স্তর সংখ্যা নিয়ে চলমান বিতর্কের আশু অবসান সহজ হবেনা। স্তর বিতর্কের অন্যপিঠে বিশেষজ্ঞ পর্যায়েও বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বর্তমানে প্রচলিত চার স্তর কাঠামো এখানে কখনও সফল হবেনা। কেননা, বর্তমান আইন কাঠামো অনুযায়ী এই চার স্তর কার্যকর হলে এদেশে ৪০ হাজার ৫০০ গ্রাম পরিষদ, ৪৪৭৬টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪৬৮টি উপজেলা পরিষদ, ৬৪টি জেলা পরিষদ, ২৫০টির অধিক পৌরসভা, ৬টি সিটি করপোরেশন ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় ৪৫ হাজার ৮০০টি বিভিন্ন আকারের স্থানীয় সরকার সংগঠন সৃষ্টি হবে। এভাবে দেশের নদীনালা, খালবিল, পাহাড়-পর্বত বাদে প্রায় প্রতি বর্গমাইলে গড়ে একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হবে। আর এসব সংগঠনে নির্বাচিত নেতার সংখ্যা হবে প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার। অবশ্য এরই মধ্যে নতুন আইন করে দেশের ৮০ হাজার গ্রামে 'গ্রাম সরকার' গঠিত হলে সে অবস্থা আরও ভয়াবহ হতে পারে। এই বিপুল সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারি অর্থায়ন, তদারক, তত্ত্বাবধান, প্রশিক্ষণ কতটুকু সম্ভব হবে তা প্রশ্নসাপেক্ষ' (আহমেদ ২০০২ : ৩১)।

এ সকল সমস্যার বাইরে আরও কিছু সমস্যার উদ্ভবও অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী বিষয়ে পারস্পরিক অধিক্রমণ (overlapping); সীমিত সম্পদের জন্য (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে) তীব্র প্রতিযোগিতা; নির্বাচনী সংঘাত সংঘর্ষের ব্যাপক বিস্তার; স্থানীয় কর রাজস্বের উৎস বিভাজন ও আদায়ের কর্তৃত্ব নিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আইনগত বিরোধ ইত্যাদি বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছাতে পারে। তদুপরি, একভাষাভাষী (আদিবাসী ও উপজাতি বাদে) ও একই জাতিগোষ্ঠীর এবং এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র একটি দেশে এ জাতীয় বহু স্তর পদ্ধতি আঞ্চলিক বিভাজনকে উৎসাহিত করতে পারে। গণদাবীর মুখে বিগত বছরগুলোতে নতুন করে দ'ুটি বিভাগ স্থাপন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন উস্কে দিয়েছে। জনদাবী পূরণের নামে নতুন নতুন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠনের পেছনে ক্রিয়াশীল রয়েছে শাসক গোষ্ঠীর কথিত জনতুষ্টিবাদ; স্থানীয় সরকারের নানা স্তরে নির্বাহী ক্ষমতা চর্চায় অতি উৎসাহী আমলাতন্ত্র; স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে ইচ্ছুক রাজনীতিবিদ; এবং নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার ফলে বৈষয়িকভাবে লাভবান হবার সুযোগ পেতে পারেন এমন স্বার্থবাদী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহের অপ্রকাশ্য একটি কোয়ালিশন।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন এবং সার্বিক জাতীয় উন্নয়নের সূচনা ও পরিচালনা করতে হলে স্থানীয় সরকারের স্তর বিতর্কের ইতি টানা উচিত। এ লক্ষ্যে প্রথমতঃ মাঠ প্রশাসনের স্তর কিংবা প্রশাসনিক একাংশ হিসেবে বিদ্যমান বিভাগসমূহ বিলুপ্ত করে দেয়া উচিত। বিভাগীয় পর্যায়ের সকল সম্পদ, জনবল ও ক্ষমতা জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে ন্যস্ত করা উচিত। প্রশাসনিক এ স্তরটি মধ্য স্তরের কতিপয় আমলার জন্য পদ বিতরণ এবং ক্ষমতা চর্চার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়া গঠনমূলক কোন ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়নি। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও সংস্কার কমিটিও প্রশাসনিক একাংশ হিসেবে মহকুমা ও বিভাগ বিলুপ্তির যুগান্তকারী সুপারিশ করেছিলেন (আহমেদ ১৯৯৮ : ৬)। মহকুমা বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে জেলা গঠন করা হলেও সামরিক শাসকবর্গ কৌশলগত কারণেই বিভাগের উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেননি।

নতুন আঙ্গিকে উপজেলা পরিষদ গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা পরিষদেরও প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার কথা এবং বিভিন্ন গবেষণায় জেলা পরিষদের দায়-দায়িত্ব ও সম্পদকে উপজেলা পরিষদসমূহের মধ্যে বিতরণ করে দিয়ে জেলা পরিষদকে বিলুপ্ত করার সুপারিশ করা হয় (Faizullah 1982 : 364-65)। এ ক্ষেত্রে অবশ্য মধ্যপন্থা হিসেবে জেলা পরিষদকে একটি আঞ্চলিক পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ হিসেবে রূপান্তর করা যেতে পারে। এই পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের অধীনেই ইউনিয়ন পরিষদের ইউনিয়ন পরিকল্পনা বই এবং উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত উপজেলা পরিকল্পনা বই এর সমন্বয়ে জেলা পরিকল্পনা বই প্রণয়ন করা যেতে পারে। থানা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদই হবে সকল উন্নয়ন তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু এবং উপজেলার সমন্বিত উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের মূল সমন্বয়কেন্দ্র। ইউনিয়ন পরিষদ কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও জেলা পরিষদের হাতে ন্যস্ত করার প্রবণতা বন্ধ করা হলে এ প্রতিষ্ঠানটি তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র চর্চা ও উন্নয়ন তৎপরতার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পারে।

গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের কোন স্তর না থাকাই শ্রেয়। কেননা প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক কারণে স্থানীয় সরকারের স্তর সংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলবে। প্রায় ৪০ হাজার ৫০০ গ্রাম পরিষদের কাজ কর্ম তদারক, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ করা দুঃসাধ্য। ইউনিয়ন পরিষদের কাঠামোর মধ্যে গড়ে তোলা গ্রাম পরিষদের জন্য অর্থ ও সম্পদের

যোগান কোন্ উৎস থেকে এবং কোন্ পন্থায় সম্ভব সে বিষয়েও বিপজ্জনক অনিশ্চয়তা রয়েছে। গোপন ব্যালট প্রথায় যেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠান অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ সেখানে গ্রামবাসীদের প্রকাশ্য সম্মেলনের মাধ্যমে গ্রাম পরিষদের সভাপতি ও সদস্যদের নির্বাচন আরও ঝুঁকিপূর্ণ হবে। আবার একটি ওয়ার্ডে কোথাও একাধিক গ্রাম থাকবে, কোথাও কোন গ্রামের অংশ বিশেষ নিয়ে ওয়ার্ড গঠিত হবে। এমতাবস্থায় চাপিয়ে দেয়া এই গ্রাম পরিষদ সনাতনী গ্রাম কাঠামোতে বিপর্যয় নিয়ে আসবে (আহমেদ ১৯৯৮ : ১৬২)।

৩. উপজেলা পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন

উপজেলা পরিষদ ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে সামরিক সরকারের হাতে সৃষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। উপজেলা ব্যবস্থার তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত ক্ষমতা স্থানীয় পর্যায়ে হস্তান্তর করা (Devolution of Central Government Authority) বা ক্ষমতার স্থানীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ (সিরাজুদ্দীন ২০০২: ৫) । ১৯৮০'র দশকে বাংলাদেশে সূচিত প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ক সরকারি উদ্যোগকে এক ধরনের প্রত্যাশিত হস্তক্ষেপ বলে গণ্য করা যায়। কেননা, এ সময়কার প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠন উদ্যোগের ঘোষিত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে ছিল-

- প্রশাসন ও উন্নয়ন ব্যবস্থার সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক নিবিড় করা;
- রাষ্ট্রীয় সেবাসমূহকে অপেক্ষাকৃত কম সুবিধাভোগীদের কাছে সহজলভ্য করা;
- প্রশাসনে জবাবদিহিতা সৃষ্টি করা;
- আমলাতান্ত্রিকতা হ্রাস করে জনপ্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করা;
- একটি গণতান্ত্রিক কাঠামো সৃষ্টি করা; এবং
- স্বশাসিত ও আত্মনির্ভরশীল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠবে (পরিকল্পনা কমিশন : ১৯৮০)। এ সকল উদ্দেশ্যের যথাযথ বাস্তবায়ন হলে গ্রামের শক্তিহীনতা ও সম্পদহীনতার অবসান ঘটতে পারে।

বিকেন্দ্রীকরণের পেছনে দু'ধরনের উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল থাকে বলে ডায়না কণিয়ার্স উল্লেখ করেছেন (বদিউজ্জামান : ১৩৯৬)। প্রথম উদ্দেশ্যটি প্রকাশ্যে বলা হয়ে থাকে যাকে বলা যায় বিকেন্দ্রীকরণের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য; দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি প্রচ্ছন্ন থাকে - যা মুলতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জনা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উপজেলা ব্যবস্থার ঘোষিত লক্ষ্য অবশ্যই ইতিবাচক। এ ব্যবস্থার অনেকগুলো সুফল পাওয়া শুরু হয়েছিল এবং আশা করা হচ্ছিল যে, উপজেলা ব্যবস্থা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে, উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যটি ছিল দেশের উপর সামরিক শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক সার্বিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ। শাসক এলিট গোষ্ঠী উপজেলার হাতে তাৎপর্যপূর্ণ কোন প্রকার স্বায়ত্তশাসন দিতে আগ্রহী ছিলেন না; যে কারণে উপজেলা পরিষদ শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অনুদানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। উপজেলা পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রাম পর্যন্ত আমলাতান্ত্রিক জাল বিস্তৃত হয় এবং দলীয় সমর্থন বলয় সৃষ্টিতে তা ব্যবহৃত হয়।

১৯৯০ সালের শেষের দিকে ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে জয় লাভ করে দ্বিতীয় বিএনপি সরকার গঠিত হয়। এ সরকার অজ্ঞাত কারণে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করেছেন (আহমেদ ২০০২ : ২৪) । ২৪ নভেম্বর ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে তদানিন্তন তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদাকে প্রধান করে গঠিত 'স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন' ইউনিয়ন ও জেলা পর্যায়ে দু'স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। কিন্তু কমিশনের সুপারিশের আগেই ১৯৯১ এর নভেম্বরে প্রথমে উপজেলা চেয়ারম্যান পদ এবং পরে খোদ উপজেলা পরিষদই বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। জনশ্রুতি রয়েছে যে, ১৯৯০ সালের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বিএনপি'র ব্যর্থতা; দলীয় নেতৃত্বের খেয়ালীপনা, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত সহনশীলতার অভাব ইত্যাদির কারণেই মূলতঃ উপজেলার মত একটি সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠানের অপমৃত্যু ঘটেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিএনপি সরকার কর্তৃক উপজেলা পরিষদের বিলুপ্তির বিষয়টি একাডেমিক সার্কেলে সহজভাবে গ্রহণ করা হয়নি (আহমেদ ১৯৯৮ : ১৩২)। কেননা, উপজেলা পদ্ধতি বাতিলের স্বপক্ষে যত যুক্তিই থাকুক না কেন এ পদ্ধতি বাতিলের ফলে যে সকল আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সেগুলোর তুলনায় এ সকল যুক্তি যথেষ্টই দুর্বল (Ali : 1995)। উপজেলা পদ্ধতি বাতিল করার ফলে যে সকল আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হল:

- উপজেলা পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং সরকারি তহবিল বরাদ্দ হ্রাস পেয়েছে।
- উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিশাল বাহিনী কার্যত অলস, হতোদ্যম হয়ে পড়েছেন।
- থানা পর্যায়ে নগরায়ন প্রক্রিয়া স্তিমিত হয়ে পড়েছে; থানা সদরে জমির মূল্য হ্রাস পেয়েছে; এবং এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে শহরমুখী জনস্রোত আরো তীব্র আকার ধারণ করেছে।
- উপজেলা পর্যায়ের উদ্যোক্তা, ঠিকাদার, ও ব্যবসায়ীগণ, যারা এতদিন বিপুল কলেবরের উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত ছিলেন, তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। কেননা, নতুন কোন কাজের সন্ধান তাদের কাছে নেই; পক্ষান্তরে, তাদের অনেকেরই বকেয়া বিল সরকারের কাছে পড়ে রয়েছে।
- উপজেলা পদ্ধতির পরিবর্তে উন্নয়ন কর্মকান্ড কেন্দ্রমুখী হয়ে পড়ায় গ্রামীণ অর্থ সঞ্চলন (money circulation) হ্রাস পেয়েছে এবং পল্লীর জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতাও হ্রাস পেয়েছে।
- স্হানীয় পর্যায়ে যে সকল মামলার মীমাংসা সহজেই করা সম্ভব ছিল আদালত স্হানান্তরের ফলে তাও কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে জনসাধারণের ভোগান্তি যেমন বেড়েছে তেমনই মামলা পরিচালনার ব্যয়ভারও বহুগুণ বেড়ে গেছে ।
- দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত উপজেলা থেকে পুনরায় জেলা সদরে স্হানান্তরের ফলে উপজেলাকেন্দ্রিক তরুণ আইনজীবীবৃন্দ বিরূপ ও কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখী হয়েছেন।

এ সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় রাখলে উপজেলা পদ্ধতি বাতিল করাকে সরকারের পেছনের দিকে হাঁটা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। হয়তোবা এ সকল বিষয় বিবেচনায় রেখেই ড. আতিউর রহমান উপজেলা পরিষদের বিলুপ্তির সিদ্ধান্তকে ময়লা জল ফেলতে গিয়ে বালতি ফেলে দেয়ার সাথে তুলনা করেছেন (আহমেদ ১৯৯৮ : ১৩২)।

রাজনৈতিকভাবেও উপজেলা বিলুপ্তিকে সহজভাবে গ্রহণ করা হয়নি। উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছিল তৃণমূল পর্যায়েও তার ইতিবাচক প্রভাব প্রতিফলিত হতে শুরু করেছিল। ফলে জনসাধারণ উপজেলা পদ্ধতির বিলুপ্তিতে হতাশ ও বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। উপজেলা বিষয়ে জনমত ও একাডেমিক সার্কেলের আগ্রহ লক্ষ্য করে আওয়ামী লীগ তাদের দ্বিতীয় পাঁচ বছরের (১৯৯৬-২০০১) শাসনকালে উপজেলা পুনঃপ্রবর্তনসহ চার স্তরের একটি স্থানীয় সরকার কাঠামো দিয়ে আইন প্রণয়ন সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে তিনজন মহিলা সদস্যের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন আইন এ সরকার বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি।

২০০১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে জনমতের কথা বিবেচনায় রেখে দেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল তাদের নিজ নিজ নির্বাচনী ইশতেহারে উপজেলা ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন বিষয়ে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ঘোষণা করে। ক্ষমতাসীন বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহারের ''৩.৬ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা'' শীর্ষক শিরোনামে উপজেলা প্রসঙ্গে দেয়া বক্তব্য থেকে উদ্বৃত করা হল,''প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদ গঠন এবং পরিকল্পিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেগুলিকে সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে'' (সূত্র: উজ্জীবক বার্তা, ৪১ তম সংখ্যা, এপ্রিল ২০০২)।

পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ''১২. স্থানীয় সরকার ও জনগণের ক্ষমতায়ন'' শীর্ষক শিরোনামে যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় তা থেকে অংশবিশেষ উদ্বৃত করা হচ্ছে, ''(ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ-এই চার স্তর বিশিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংসদে আইন পাশ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে সর্বাগ্রে জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের নির্বাচনসহ সকল স্তরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ইতিমধ্যে গৃহীত আইন ও স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তর করবে'' (সূত্র: উজ্জীবক বার্তা, ৪১ তম সংখ্যা, এপ্রিল ২০০২)।

২০০১ খ্রিষ্টাব্দের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জয়লাভ করে এবং নতুন সরকার গঠিত হয়। সংশ্লিষ্ট সকলেই আশা করেছিলেন যে, বিএনপি'র নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী সহসাই উপজেলা পরিষদ গঠিত হবে এবং এ পরিষদের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে। সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য একটি মন্ত্রিসভা কমিটিও গঠন করেছেন। এর মধ্যে বিগত ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২ খ্রিষ্টাব্দের 'প্রথম আলো' পত্রিকায় 'উপজেলা নিয়ে তীব্র মতবিরোধ' শীর্ষক একটি খবর প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনটি থেকে জানা যায়, ''উপজেলা ব্যবস্থা নিয়ে সরকার সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত মন্ত্রিসভা কমিটি উপজেলা প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। একটি পক্ষ চান উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিন। অপর পক্ষ চান উপজেলায় স্থানীয় সংসদ সদস্যদের পরামর্শক্রমে সব উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হোক। শেষোক্ত গ্রুপ উপজেলা নামটিরও বিরোধিতা করছেন। তারা চান স্থানীয় সরকারের এই স্তর উপজেলা'র পরিবর্তে 'থানা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি' নামে পরিচিত হোক। মন্ত্রিসভা কমিটির এই গ্রুপ স্পষ্টতই উপজেলার গুরুত্ব হ্রাস করতে আগ্রহী। কারণ তারা ক্ষমতা হ্রাস করার প্রস্তাব করেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না, তারা উপজেলা নামটিরও বিলোপ চান, যাতে উপজেলা স্তরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কখনো মাথা তুলতে না পারে'' (জাহাঙ্গীর ২০০২ক :৭)। সরকারের মধ্যকার এ ধরনের মতভেদের প্রসঙ্গটি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর একাডেমিক সার্কেলে পুনরায় উপজেলা নিয়ে লেখালেখির সুত্রপাত হয়। উপজেলা বিষয়ে সরকারের দোদুল্যমানতার জন্য ড. মাশরাফী বিএনপি'র অন্তর্গত আইনজ্ঞ লবিকে দায়ী করেছেন। আইনজ্ঞ লবির এই অবস্থানকে হেস্টিংসীয় অবস্থান হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি লিখেছেন, ''এই লবিটি উপজেলা স্তর থেকে বিচার প্রক্রিয়াকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য পুরো উপজেলা ব্যবস্থাকে বাতিল করবার ব্যবস্থা করেছিল। অথচ তখন উপজেলা ব্যবস্থা ছিল জনকল্যাণকর, জনপ্রিয় এবং ইতিবাচক অর্থে বিকাশমান'' (মাশরাফী ২০০২খ : ৫)। এর মধ্যেই সংবাদ মাধ্যমে একটি হতাশাব্যঞ্জক ব্যাপারও বেরিয়ে এসেছে। বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহারে উপজেলা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের যে অঙ্গীকার ছিল সেটিকে এখন বলা হচ্ছে- 'কৌশলগত' অঙ্গীকার (প্রথম আলো ২৮-০২-২০০২)। যদি একথা সত্যি হয়ে থাকে তা হলে তাতে রাজনৈতিক দলের গণবিচ্ছিন্নতা যেমন প্রকট হয়ে উঠে তেমনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রবঞ্চনার বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ দুটোই যুগপৎ অগণতান্ত্রিক ও প্রহসনমূলক (মাশরাফী ২০০২খ : ৫)। এ বিতর্কের অবসান ঘটানোর সর্বোত্তম পন্থাটি হ'ল নির্বাচনী অঙ্গীকার রক্ষা করে একটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

৪. স্থানীয় সরকারের উপ-স্তর

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিষয়ে সাংবিধানিক নির্দেশনায় অস্পষ্টতা; এবং স্থানীয় সরকার বিষয়ক আইনের জটিলতার সুযোগে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর দলীয় স্বার্থ রক্ষা ও তৃণমূল পর্যায়ে সমর্থক সৃষ্টি ও লালন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের আনুষ্ঠানিক স্তরসমূহের পাশাপাশি স্থানীয় সরকারের সৎভাই হিসেবে নানারকম অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়াস অতীতে লক্ষ্য করা গিয়েছে; বর্তমানেও যাচ্ছে । ১৯৭১-১৯৭৫ কালপর্বে গঠিত বিতর্কিত 'রিলিফ কমিটি' এবং গ্রাম সমবায় (প্রস্তাবিত) দিয়ে এ উদ্যোগের সূচনা হলেও পরবর্তী শাসকগণ এজাতীয় উদ্যোগের সুফল (!) বিষয়ে অতিশয় আস্থাশীল থেকেছেন (যদিও শাসকবর্গ পূর্ববর্তী শাসক দল এবং দলীয় নেতৃত্বের সমালোচনায় সদা মুখরিত থাকেন)। ১৯৭৬-১৯৮২ কালপর্বের গ্রাম সরকার ও যুব কমপ্লেক্স; ১৯৮২-১৯৯০ কালপর্বের পল্লী পরিষদ; ১৯৯৬-২০০১ কালপর্বে গ্রাম পরিষদ (প্রস্তাবিত) গঠন কিংবা গঠনের প্রয়াস এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। ১৯৭১-৭৫ কালপর্বের ইউনিয়ন রিলিফ কমিটি ছিল যুগপৎ আলোচিত ও সমালোচিত একটি ব্যবস্থা। স্থানীয় সংসদ সদস্য, এবং স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব কর্তৃক রিলিফ কমিটির সদস্যগণ মনোনীত হতেন বলে এ প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপক দলীয়করণের মুখে পতিত হয়। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোয় দলীয় অবস্থানকে সুসংহতকরণ; আর্থিক সুবিধাদি বিতরণের মাধ্যমে দলীয় কর্মী সমর্থকদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ; ইত্যাদি উদ্দেশ্য অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে রিলিফ কমিটি ব্যাপক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ফলতঃ আওয়ামী লীগের ব্যাপক জনসমর্থনে ধ্বস নামার অন্যতম কারণ হিসেবেও রিলিফ কমিটিকে দায়ী করা হয়।

১৯৭৬-১৯৮২ কালপর্বেও আমরা একই রকম ব্যাপার লক্ষ্য করি। এ সময়ে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩-৩১ জানুয়ারী বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নবনির্বাচিত ইউ-পি নেতৃত্বের মধ্যে তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীর সমর্থকদের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত । ফলে শাসকগোষ্ঠী স্থানীয় সরকারের এই স্তরটিকে (ইউনিয়ন পরিষদ) 'পরাস্ত' করতে তৎপর হয়ে ওঠেন এবং বিকল্প শক্তি হিসেবে গ্রাম সরকার গঠন করেন (আহমেদ : ১৯৯৩) । স্বভাবতঃই গ্রাম সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মেকি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে দলীয় সংগঠন বিস্তার ও সমর্থক সৃষ্টির মাধ্যমে 'নয়া কর্তৃত্ববাদ'

প্রতিষ্ঠা করা (Zaman : 1989)। যা হোক, আর্থিক সমস্যাবলী; প্রয়োজনীয় ক্ষমতার অভাব; নেতৃত্বের কোন্দল; ও প্রাতিষ্ঠানিক দ্বন্দ্বের কারণে গ্রাম সরকার ব্যর্থ হয় (Faizullah : 1987)। ১৯৮২ সালে সামরিক সরকারের হাতে গ্রাম সরকারের বিলুপ্তি ঘটে। গ্রাম সরকার গঠন বিষয়ে দেশের একজন প্রবীণ আমলা এবং সাবেক সচিব মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন একটি বাস্তব ও আকর্ষণীয় চিত্র এঁকেছেন। তাঁর বক্তব্য থেকে উদ্বৃত করা হ'ল, ''আমার জেঠা শামসুল হক এ আইনের (এখানে ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধিত স্থানীয় সরকার আইন, ১৯৭৬ এর কথা বলা হয়েছে) ফাঁক খুঁজে নিয়ে নিজেকে (গ্রাম সরকারের) চেয়ারম্যান, জেঠাইমাকে মহিলা প্রতিনিধি, তাঁর এক ছেলেকে যুব প্রতিনিধি, এক মেয়েকে যুবতী প্রতিনিধি, এক ছেলেকে ভূমিহীন, এক ভাইকে প্রান্তিক চাষী ইত্যাদি পদে নির্বাচন / মনোনয়ন দান করে আমাদের হাস্যরসের উদ্রেক করেছিলেন (সিরাজুদ্দীন ২০০২ : ৫)। হুবহু না হলেও একই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তির কথা নানা সূত্রে উল্লেখ করা হয়। সম্ভবতঃ এ সকল কারণে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে (১৯৯১-১৯৯৬) শাসক দল বিএনপি গ্রাম সরকার প্রসঙ্গে উৎসাহ দেখায়নি। কিন্তু দ্বিতীয় মেয়াদে বিএনপি সরকার (১৯৯১-১৯৯৬) গ্রাম সরকার নিয়ে তেমন কিছু না বললেও ২০০১ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রকাশিত নির্বাচনী ইশতেহারে পুনরায় গ্রাম সরকার বিষয়ে অঙ্গীকার ঘোষণা করে। ইশতেহারে বলা হয়েছে ''স্থানীয় শাসনকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং গ্রাম পর্যায়ে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রাম সরকার ব্যবস্থাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা এবং বেগবান করা হবে ।'' উপজেলা নিয়ে বিতর্কের প্রেক্ষাপটে সরকার এখন গ্রাম সরকারের পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে মর্মে জনকণ্ঠ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে (হক ২০০২ : ৩)। অতীতের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, তৃণমূল পর্যায়ে দলীয় সমর্থকদের ক্ষমতা সুসংহতকরণ কিংবা দলীয় প্রভাব বলয় বৃদ্ধি; ইউনিয়ন পরিষদের বিকল্প একটি ক্ষমতাকেন্দ্র ও সমর্থন বলয় সৃষ্টি; এবং এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচনে পরাজিত দলীয় কর্মীদের পুরস্কৃতকরণ ছাড়া এজাতীয় অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের তেমন কোন ইতিবাচক ভূমিকা নেই। বরং ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে ক্ষমতা, এখতিয়ার, ও সম্পদ ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি; গ্রাম সরকার গঠনের জন্য প্রকাশ্যে মনোনয়ন পদ্ধতি অনুসরণের ফলে ব্যাপক দলীয় সংঘাত সৃষ্টির আশংকা, ইত্যাদির ফলে এ জাতীয় প্রয়াস তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্রের ভিত্তিকেই দুর্বল করে ফেলতে পারে।

৫. উপজেলা পরিষদে জাতীয় সংসদ সদস্যের ভূমিকা

স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে হলে উপজেলা পরিষদের ভূমিকাকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। যাঁরা উপজেলা পরিষদের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁদের অবস্থান সঙ্গত কারণেই একটি কার্যকর ও দক্ষ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিপক্ষেই যাচ্ছে। সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা যায়, স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা কী হবে, উপজেলা চেয়ারম্যানদের সঙ্গে তাদের বিরোধ হবে কিনা - এটাই উপজেলা পরিষদ থাকা বা না থাকার বিতর্কের পেছনের কারণ (প্রথম আলো, সম্পাদকীয় : জুন ৪, ২০০২)। দ্বিতীয় আওয়ামী লীগ সরকার সপ্তম জাতীয় সংসদে উপজেলা আইন, ১৯৯৮ পাশ করার পর স্থানীয় জাতীয় সংসদ সদস্যকে উপজেলা পরিষদে উপদেষ্টার পদ দেয়ার বিধান করা হয়। বর্তমান সরকার সে ভূমিকাকে আরও জোরদার করার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদকে জাতীয় সংসদ সদস্যের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এ জাতীয় নিয়ন্ত্রণের ফলে দেশে একটি শক্তিশালী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থার অনুকূলে বিরাজমান জনসাধারণের সাধারণ অভিপ্রায় পদদলিত হতে পারে, এমন আশংকা প্রবল।

উপজেলা পরিষদে স্থানীয় সংসদ সদস্যের ভূমিকা সম্পর্কে চলমান বিতর্কে সংবাদ মাধ্যম, স্থানীয় সরকার বিষয়ক গোষ্ঠী, এবং একাডেমিক সার্কেল উপজেলায় সংসদ সদস্যের ভূমিকার জোরালো বিরোধিতা করেছেন। জাতীয় সংসদ সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে মৌলিক একটি পার্থক্য রয়েছে। সংসদ সদস্যগণ আইন ও নীতি প্রণেতা। পক্ষান্তরে, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিগণ মূলতঃ উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়নকারী এবং কিছু কিছু নাগরিক সেবা প্রদানের দায়িত্বপালনকারী। সুতরাং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজনীতিকীকরণ করা হলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ রাজনৈতিক মতবিরোধীদের নাগরিক সেবাসমূহ এবং উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত করতে উদ্যত হতে পারেন (Siddiqui 2000: 64) । আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে শাসক দলের সাধারণ সম্পাদক / মহাসচিবগণকে স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্বে প্রদান স্থানীয় সরকারের ক্রমবর্ধমান রাজনীতিকীকরণ প্রয়াসের প্রকাশ মাত্র। উপজেলা পরিষদের উপর সংসদ সদস্যের ভূমিকা বিষয়ে রাজনৈতিক সংস্কার প্রচারাভিযান-এর একটি প্রকাশনায় বলা হয়েছে, একটি স্বাধীন ও স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সামগ্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ তাতে দারুনভাবে বাধাগ্রস্ত হবার আশংকা রয়েছে। উপজেলা পরিষদের উপর জাতীয় সংসদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে নীতি ও আইনগত। একজন সংসদ সদস্যকে সংবিধান আইন পরিষদে ভূমিকা পালনের অধিকার দিয়েছে। তিনি একটি

নির্বাচিত স্থানীয় পরিষদের দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করবেন তা সংবিধানের ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির বহির্ভূত কাজ (আহমেদ ২০০২ : ২৫)। আবার, এই বিতর্কে দুই প্রধান দলের মধ্যে বড় রকমের বিরোধ নেই। দুই প্রধান দলের নির্বাচিত এমপি'রা মনে করেন 'উপজেলা' তাদের জন্য একটা হুমকি। ... দ'ুটি বড় রাজনৈতিক দল তাদের দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থে 'স্থানীয় সরকার' ব্যবস্থাকে ঠুটো জগন্নাথে পরিণত করার চেষ্টা করছে। শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানি প্রশ্নে বড় দু'দলের এমপি'রা যেমন একমত হন, তেমনি উপজেলায় সংসদ সদস্যদের কর্তৃত্ব প্রশ্নেও তারা একমত (জাহাঙ্গীর ২০০২ক : ৭)। বিগত ৫ মার্চ ২০০২ ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে নবগঠিত 'স্থানীয় সরকার সহায়ক গ্রুপ' আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে অধিকাংশ বক্তাই উপজেলা পরিষদে সংসদ সদস্যদের কোন রকম ভূমিকা না রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন (জাহাঙ্গীর ২০০২খ : ৫)। একজন উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপর সংসদ সদস্যদের উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা পালন একটি কার্যকর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক নয়। সংসদ সদস্যদের জন্য এ ভূমিকা পালনকে উন্নয়নমূলক ভূমিকা হিসেবে চিহ্নিত করাও সঙ্গত নয় (Rahman 2002 : 4) । ড. শাহ দীন মালিক এর একটি উক্তি প্রথম আলো (৬ মার্চ ২০০২ ''স্থানীয় সরকার সহায়ক গ্রুপের আয়োজনে গোলটেবিল : গণতন্ত্রের প্রয়োজনে কেন্দ্রের প্রভাবহীন স্থানীয় সরকারের পক্ষে মত'' শীর্ষক প্রতিবেদনে) উদ্বৃত করেছে, 'আমাদের সংবিধানের তিনটি বিভাগ অনুসারে আইন প্রণেতারা প্রশাসনিক কাজ করতে পারেননা। ফলে স্থানীয় উন্নয়নে সাংসদদের কোন ভূমিকা রাখার সুযোগ নেই।' প্রথম আলোর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, 'যদি এমন হয় যে স্থানীয় সরকারের কাজের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যের মতামত লাগবে, স্থানীয় সরকারকে তার কথামতো চলতে হবে, তখন দ্বৈত শাসন বা কর্তৃত্বমূলক একটা কিছু হয়ে যেতে পারে'' (প্রথম আলো, মার্চ ৩, ২০০২)। ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২ খান ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় শাসন নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকেও স্থানীয় সরকারের উপর সংসদ সদস্যদের ভূমিকার ব্যাপক বিরোধিতা করা হয়। গোলটেবিল বৈঠকে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা কাজী ফজলুর রহমান কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে বলেন, সাংসদদের প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন করা। তারা গম বিতরণ করবেন এটা সংবিধানের কোথাও লেখা নেই। (প্রথম আলো, ১৮-২-০২ : ৭)। একজন প্রাবন্ধিক উপজেলা পরিষদে সংসদ সদস্যদের ভূমিকার বিরোধিতা করে লিখিত একটি নিবন্ধের উপসংহার টেনেছেন এই বলে, 'দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ ও সে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করে তোলার অংশ হিসেবেই উপজেলা

পরিষদে সাংসদদের অন্তর্ভুক্তির সাম্প্রতিক উদ্যোগ পরিহার করা উচিত বলে মনে করি'' (খান ২০০২ : ৪)। দেশের অন্যতম প্রাচীন সংবাদপত্র দৈনিক সংবাদ তার সম্পাদকীয়তে লিখেছে, ''... উপজেলায় স্থানীয় সংসদ সদস্যদের ভূমিকা নিয়ে বর্তমান সরকার একটি মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি করতে যাচ্ছে বলে আমরা মনে করছি। উপজেলা চেয়ারম্যানের ক্ষমতা ৫০ শতাংশ কমিয়ে তা স্থানীয় এমপি'দের নিয়ন্ত্রণে দেয়া; উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে স্থানীয় সংসদ সদস্যের স্থায়ী দপ্তর; উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প স্থানীয় সংসদ সদস্যের মাধ্যমে ৫০ শতাংশ বাস্তবায়নের যে সর্বনাশা নীতি সরকার নিতে যাচ্ছে তাতে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, সরকার উপজেলায় দ্বৈত শাসন এবং স্থায়ী বিরোধের বীজ বপন করছে'' (সংবাদ ৪-২-২০০২)। উদ্বিগ্ন একজন শিক্ষাবিদ লিখেছেন, 'সাংসদকে উপজেলা চেয়ারম্যানের ক্ষমতার অংশ ও উপজেলা পরিষদের বাজেটের অংশ খরচ করতে দেয়ার অধিকার দিলে একটি প্রহসনের সৃষ্টি হবে। আর তা আরও ব্যাভিচারধর্মী হবে যদি উপজেলার উন্নয়নের জন্য বছরে ১ কোটি টাকা প্রতি সাংসদকে দেয়া হয়। এটি অনেকটা ব্যক্তির দ্বারা রাষ্ট্র লুণ্ঠনের মতো ব্যাপারে পর্যবসিত হবে (মাশরাফী ২০০২ক : ৪)।

উপজেলা পরিষদের উপর সংসদ সদস্যের কর্তৃত্ব নিয়ে চলমান এ বিতর্কের মধ্যেই ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের একটি সার্কুলারের কথা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যাতে বলা হয়েছে, ''এখন থেকে স্থানীয় সংসদ সদস্য/তার অবর্তমানে জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/চীফ হুইপ/প্রতিমন্ত্রী/হুইপ/উপমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশ মোতাবেক টি আর ও কাবিখা'র সব প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে। সেই সঙ্গে তাদের লিখিত সম্মতি নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করতে হবে (তালুকদার ২০০২: ৪; সূত্র: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কাবিখা (রক্ষণাবেক্ষন) শাখার স্মারক নং- ২/৭০/২০০১-২০০২/১৪(৫৯২)/(১০৫৩) তাং- ৪-১২-২০০১ইং)। এ স্মারকের সূত্র ধরে খান ফাউন্ডেশনের পূর্বোক্ত গোলটেবিল বৈঠকে দু'জন সংসদ সদস্যসহ কয়েকজন আলোচক ইউনিয়ন পর্যায়ে টি আর ও কাবিখা'র গম বরাদ্দ থেকে সাংসদদের বাদ দেওয়ার সুপারিশ করেছেন (প্রথম আলো, ১৮-২-০২ : ৭)। অবশ্য পরবর্তীতে অন্য একটি সার্কুলার জারী করে পূর্বোক্ত সার্কুলারটি স্থগিত করা হয়।

উপজেলা পরিষদের উপর সংসদ সদস্যের কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে ১৯৯২ সালে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহম্মদ কর্তৃক আপিল বিভাগের পুরো বেঞ্চের পক্ষে দেয়া এক রায়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রায়ে তিনি বলেন, ''স্থানীয় সরকার - স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা স্থানীয় বিষয়গুলোর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে গঠিত। যদি সরকারের কর্মকর্তা কিংবা তাদের তলপিবহদের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করতে আনা হয় তাহলে এগুলোকে স্থানীয়

প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাখার কোন যৌক্তিকতা থাকে না'' (উজ্জীবক বার্তা, ৪১তম সংখ্যা : এপ্রিল ২০০২) । এ রায় যদি জাতীয় সংসদ সদস্য এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য হয় তাহলে স্থানীয় সরকারের ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপের সুযোগই তাঁদের (সংসদ সদস্য এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের) নেই। একাডেমিক সার্কেল ও প্রচার মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের উপজেলা / স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনের যে প্রবল বিরোধিতা উঠে এসেছে এবং এখনো আসছে তার পেছনে রাজনৈতিক কোন অভিপ্রায় নেই। বরং এতে স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার আন্তরিক আগ্রহ ও দুর্নিবার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে। একই কারণে নিবন্ধকারও বিশ্বাস করেন যে, সংসদ সদস্যদের ভূমিকা শক্তিশালী স্থানীয় সরকার বিকাশে কোনক্রমেই সহায়ক নয়। এ বিতর্কের শেষ প্রান্তে একজন সাবেক সচিব ও কলামিস্ট জনাব মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন এর কতিপয় তীর্যক ও শ্লেষাত্মক মন্তব্য উদ্বৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। তিনি লিখেছেন, ''উপজেলা চেয়ারম্যান একজন আঞ্চলিক নেতা, তিনি যে দলেরই হোন না কেন! তিনি উপজেলার প্রয়োজন নিরূপণ করবেন। যতো বেশী সম্ভব কেন্দ্রীয় সম্পদ আহরণ করবেন নিজস্ব এলাকার জন্য, নিজস্ব এলাকার সুপ্ত সম্পদ, প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার করবেন, জনগণের স্বার্থে জনগণের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে। তিনি ধর্না দেবেন এমপি সাহেবের কাছে যেনো তাঁর চাহিদা সরকার প্রধান, সাংসদগণ, দেশবাসী দাতাগোষ্ঠী জানতে পারে। কিন্তু বাস্তবে কি হয়? আমার সঙ্গে মর্নিং ওয়াক করেন যে সকল এমপি, তাঁদের একজন অকপটে বলেই ফেললেন, গম বিতরণ না করলে ভোট পাওয়া যাবে না পরবতী নির্বাচনে। ভোটের সঙ্গে গমের সম্পর্ক কী? আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, ভোটার জোগাড় করে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, দলের পাতি নেতা, এলাকার মিঞা ভুইয়াঁ চৌধুরী পাটোয়ারী। গম এদেঁর আয়ের উৎস, পৃষ্ঠপোষকতার অবলম্বন। ইলেকশনের ব্যয় মিটিয়ে দু'পয়সা ঘরে তোলার উপায়! আমার মনে হলো আমি বুঝতে শিখছি, কেনো মন্ত্রী মেয়র হতে চান, এমপি চেয়ারম্যান হতে চান। আমার মনে হলো আমি একটি বোকার হদ্দ! একত্রিশ বৎসর সিএসপিগিরি করেও চিনতে পারিনি গম কি জিনিস! অথবা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কেনো হযরত আদম ও বিবি হাওয়াকে গম খেতে নিষেধ করেছিলেন'' (সিরাজুদ্দীন ২০০২: ৫) ।

প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার কাঠামো

স্থানীয় সরকারের মাত্র দু'টি স্তর থাকবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে - ইউনিয়ন পরিষদ, এবং উপজেলা পর্যায়ে - উপজেলা পরিষদ। পরবর্তী পৃষ্ঠার ছকচিত্রে বৃত্তাকার অংশটুকুই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নির্দেশক। অন্যান্য সংস্থাগুলোর সঙ্গে এ দু'টি স্তরের সম্পর্ক কার্যগত; কাঠামোগত নয়।

প্রস্তাবিত স্থানীয় সরকার কাঠামো

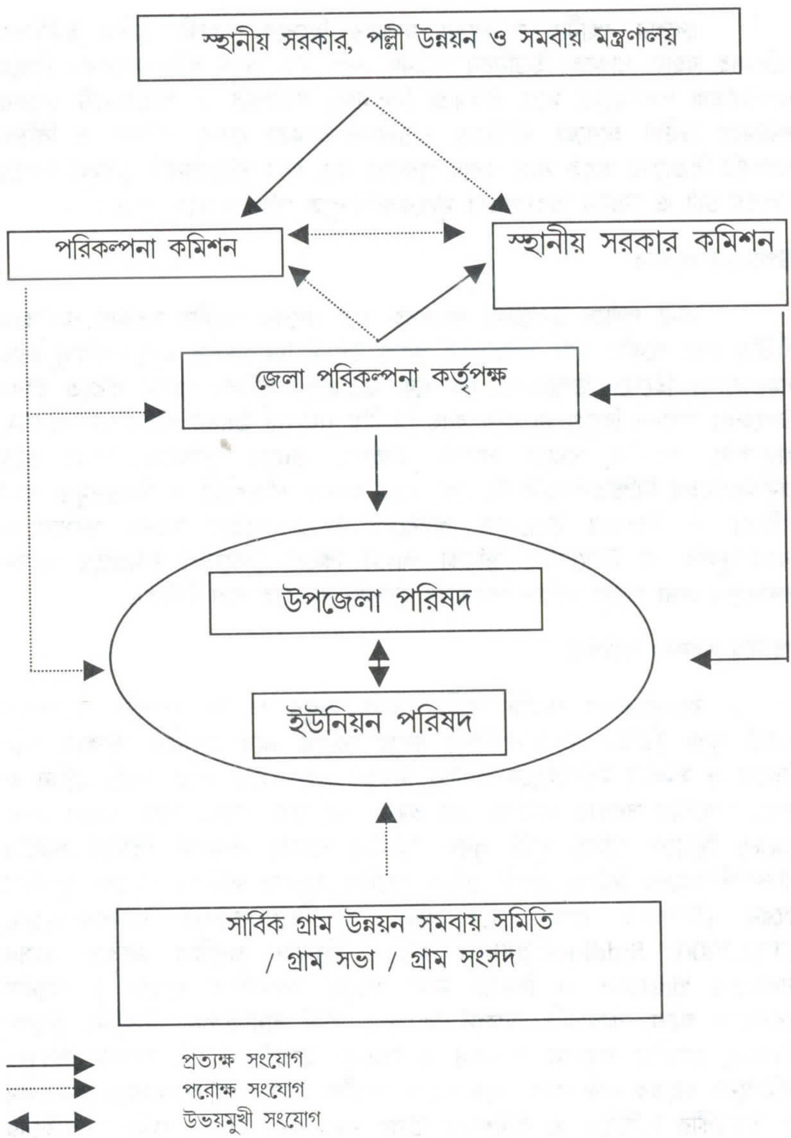

ইউনিয়ন পরিষদ

দেশের স্থানীয় সরকারের মূলস্তম্ভ হিসেবে শতাব্দী প্রাচীন ইউনিয়ন পরিষদই বহাল থাকবে। ইউনিয়ন পরিষদ এবং এর ভিত্তি শক্তিশালীকরণ বিষয়ে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে ঐকমত্য বিদ্যমান। সর্বোপরি, এ প্রতিষ্ঠানটি কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা জেলা পরিষদ ও বিভিন্ন সরকারি বিভাগের হাতে ন্যস্ত করার প্রবণতা বন্ধ হলে প্রতিষ্ঠানটি তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র চর্চা ও উন্নয়ন তৎপরতার মূলকেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পারবে।

উপজেলা পরিষদ

থানা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদই হবে দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় এবং সর্বোচ্চ স্তর। উপজেলার সকল উন্নয়ন তৎপরতার মূলকেন্দ্রবিন্দু এবং সমন্বয়কেন্দ্র হিসেবে উপজেলা পরিষদকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। উপজেলা পরিষদ বিলুপ্ত না করে বরং স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ আহরণ, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সকল স্তরে জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে একে আরও শক্তিশালী ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা উচিত। এ উদ্দেশ্যে উপজেলা পরিষদের উপর জাতীয় সংসদ সদস্যগণের নিয়ন্ত্রণমূলক বা উপদেষ্টার ভূমিকা পালন কিংবা উপজেলা কমপ্লেক্সে সংসদ সদস্যদের জন্য পৃথক অফিস স্থাপনের উদ্যোগ পরিহার করা উচিত।

স্থানীয় সরকার কমিশন

বাংলাদেশের শতাব্দী প্রাচীন অথচ ভঙ্গুর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্ত একে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র 'স্থানীয় সরকার কমিশন' এর হাতে ন্যস্ত করা যেতে পারে। ১৯৯২ এবং ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত দু'টি পৃথক স্থানীয় সরকার কমিশন স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত একটি স্বাধীন স্থানীয় সরকার কমিশন গঠনের সুপারিশ করেন (বিস্তারিত দেখা যেতে পারে, স্থানীয় সরকার কমিশন: ১৯৯৭; CPD:2000; Siddiqui:2000)। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালেও এ বিষয়টি নানা মহলে আলোচিত হয়েছে । স্থানীয় সরকারের গঠন, কার্যাবলী, সম্পদ সংস্থান, কর্মী ব্যবস্থাপনা, নির্বাচন, বিরোধ মীমাংসা, কেন্দ্রীয় অনুদান বিভাজন ও বিতরণ ইত্যাদি দায়িত্ব স্থানীয় সরকার কমিশনের হাতেই ন্যস্ত করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যবেক্ষণ ও তদারকীর দায়িত্বও এ কমিশনের উপর ন্যস্ত করা উচিত। কমিশন আইনের

অধীনে গঠিত একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হবে এবং এর কার্যকলাপের উপর মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ বা প্রশাসনিক কর্তৃত্ব থাকবেনা (স্থানীয় সরকার কমিশনের সম্ভাব্য দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত দেখা যেতে পারে, স্থানীয় সরকার কমিশন ১৯৯৭ : 23; Siddiqui 2000 : 63-66)।

জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ

নতুন আঙ্গিকে উপজেলা পরিষদ গঠন করা হলে জেলা পরিষদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার কথা। বিভিন্ন গবেষণায়ও জেলা পরিষদকে বিলুপ্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে (Faizullah 1982:364-65)। সর্বোপরি, বাংলাদেশে বিগত তিন দশকে নির্বাচিত জেলা পরিষদ হিসেবে কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বই ছিলনা। অতএব, জেলা পরিষদের কাল্পনিক অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্কে না জড়িয়ে মধ্যপন্থা হিসেবে জেলা পরিষদকে রূপান্তরিত করে জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ গঠন করা যেতে পারে। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ডেপুটি কমিশনারকে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। জেলা পর্যায়ের সকল সরকারি, আধা-সরকারি বিভাগের আঞ্চলিক / স্থানীয় প্রধানগণ জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের সদস্য হবেন। জেলার সকল সংসদ সদস্য পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের উপদেষ্টা হতে পারেন (Quddus. et al.1995)। জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের অধীনেই জেলার ভৌগলিক সীমানাভুক্ত সকল ইউনিয়ন পরিকল্পনা বইয়ের সমন্বয়ে উপজেলা পরিকল্পনা বই; এবং সকল উপজেলা পরিকল্পনা বইয়ের সমন্বয়ে জেলা পরিকল্পনা বই প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যেতে পারে। বাংলাদেশে পরিকল্পনা কমিশনের সহায়তায় জেলা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ জেলাভুক্ত সকল গ্রামের গ্রাম তথ্য বই (Village Information Book) প্রণয়নপূর্বক সে সকল বইয়ের সমন্বয়ে জেলা তথ্য বই প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে (Quddus. *et al.* ১৯৯৫)।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি / গ্রাম সভা / গ্রাম সংসদ

গ্রাম বা ওয়ার্ড পর্যায়ে মনোনয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে কোন রকম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন না করাই শ্রেয়। এ প্রচেষ্টার সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বর্তমান প্রবন্ধে পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে। একান্তই কিছু করতে হলে বিবেচনার জন্য এখানে তিনটি বিকল্প তুলে ধরা হল:

প্রথম বিকল্প:

মনোনীত কোন অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেয়ে গ্রামের সকল নারী, পুরুষ ও শিশু-কিশোরের জন্য উন্মুক্ত সদস্য পদের ব্যবস্থা রয়েছে এমন একটি ‘সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি’ বা অনুরূপ কোন সংগঠন গড়ে তোলা যায়।

তবে এ সংগঠনটিকে কোনভাবেই স্হানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হবেনা। সদস্যপদের প্রকৃতির বিচারে এটা অবশ্যই স্হানীয় পর্যায়ের সমষ্টি সংগঠন হিসেবে কাজ করবে। এক গ্রাম-এক সংগঠন ভিত্তিতে গঠিত এই সমিতি কৃষি উন্নয়ন; সেচ ব্যবস্হাপনা; হাঁস-মুরগী ও পশুসম্পদ উন্নয়ন; মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন; শিক্ষা বিস্তার; মহিলা ও শিশু উন্নয়ন; সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ উন্নয়ন; গ্রাম তথ্য বই ও গ্রাম পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইত্যাদি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে। সদস্যদের প্রত্যক্ষভোটে নির্বাচিত সমিতির সভাপতি ইউনিয়ন পরিষদের ভোটাধিকারবিহীন সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

দ্বিতীয় বিকল্প:

প্রতিটি ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডকে একক ধরে নিয়ে ওয়ার্ডের সকল ভোটারের সমন্বয়ে এক একটি গ্রাম সংসদ / গ্রাম সভা গঠন করা যেতে পারে। দারিদ্র্য বিমোচন; এ জাতীয় প্রকল্পের আওতায় আনার যোগ্য ব্যক্তি/পরিবার চিহ্নিতকরণ; বয়স্ক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা উৎসাহিতকরণ; ওয়ার্ড পর্যায়ে পারিবারিক তথ্য সংগ্রহ করে ওয়ার্ড তথ্য বই প্রণয়ন; ওয়ার্ডের জন্য প্রকল্প চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন ইত্যাদি কাজসহ প্রস্তাবিত গ্রাম সরকারের জন্য নির্বারিত কার্যাবলী এ সংসদের উপর ন্যস্ত করা যেতে পারে। পশ্চিম বঙ্গে অনুরূপ একটি সংগঠন সাফল্যের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে (বিআরডিবি - জাইকা, ২০০২)। এ সংগঠনটি স্হানীয় সরকারের আনুষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে থাকবে; তবে ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে এর ঘনিষ্ট উন্নয়নমূলক সম্পর্ক থাকবে। ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম সংসদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে উন্নয়ন কার্যক্রম সংগঠিত করবে। যেহেতু সকল ভোটারের জন্য সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকবে সেহেতু কোন প্রকার নির্বাচন / মনোনয়ন পদ্ধতি এবং তৎসংশ্লিষ্ট সংঘাত সংঘর্ষের আশংকাও এক্ষেত্রে থাকবেনা।

তৃতীয় বিকল্প:

গ্রাম সংসদ দ্বিতীয় বিকল্প অনুযায়ী গঠিত হবে, এবং এর নিবহী কমিটি হিসেবে গ্রাম সরকার বা অনুরূপ কোন পরিষদ সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে গঠন করা যেতে পারে। গ্রাম সংসদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে নির্বাহী ক্ষমতা গ্রাম সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে। উভয় ক্ষেত্রে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর গ্রাম সংসদের সাধারণ সভা, এবং প্রতি বছর জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। গ্রাম সরকার কিংবা গ্রাম সংসদ উভয় ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচিত ইউপি সদস্য পদাধিকার বলে পরিষদের সভাপতি হবেন।

উপসংহার

বাংলাদেশের বিগত পঞ্চাশ বছরের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে চাঞ্চল্যকর ও চমকপ্রদ যে তথ্যটি পাওয়া যায় তা হ'ল, এ দেশে যখনই সামরিক শাসকগণ ক্ষমতায় এসেছেন তখনই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আবার সামরিক শাসনের অবসানের পর নির্বাচিত বেসামরিক ও দলীয় সরকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে অবহেলা করেছেন কিংবা এদিকে যথাযথ মনোযোগ দেননি । ফলতঃ অবস্থাটা এমন হয়েছে যে, যখন কেন্দ্রে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সরকার থাকে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তখন দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে; আবার কেন্দ্রে সামরিক বা অগণতান্ত্রিক সরকার থাকলে তারই সঙ্গে শক্তিশালী ও গণভিত্তিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা তৈরী হতে শুরু করে। এ প্রবণতা অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও সত্য। তবে সুখের কথা এই যে, বিগত দশকটিতে (১৯৯১-২০০১) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিষয়ে দেশে ব্যাপকভিত্তিক আলোচনা, পর্যালোচনা, গবেষণা ইত্যাদি অব্যাহত ছিল এবং এখনও রয়েছে। বিগত দু'দশকে স্থানীয় সরকার বিষয়ে তিন তিনটি কমিশন গঠিত হয়েছে। প্রত্যেক কমিশনই তাঁদের নিজেদের মত করে কার্যকর ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সুপারিশ পেশ করেছেন এবং সরকারও সে অনুযায়ী অনেক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা যতই সমস্যা সংকুল থাকুক না কেন, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ এবং সরকার একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে যথেষ্ট আন্তরিক বলেই প্রতীয়মান হয়। ১৯৯১, ১৯৯৬, এবং সর্বশেষ ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী ইশতেহারে স্থানীয় সরকারের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে স্থান পেয়েছে। তিনটি স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশেও একটি ঐকমত্যের বাতাবরণ বহুলাংশে তৈরী হয়ে রয়েছে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায়ও যেনতেনভাবে পরিবর্তন ঘটাতেই হবে, এমন অবিবেচনাপ্রসূত একটি ধারণা এ দেশে প্রচলিত রয়েছে যা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশে সহায়ক নয় । স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে এ জাতীয় পরিবর্তনের ফলেই এ দেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা এখনও শেকড় নিতে পারেনি। অতএব, এরকম কর্মকৌশল ত্যাগ করে প্রকৃত গণতান্ত্রিক চেতনা এবং বিকেন্দ্রীকরণের মৌলিক উদ্দেশ্য পূরণে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হলেই কেবল স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সংস্কার সাধনে তৎপর হওয়া উচিত। অন্যথায় অর্থহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা স্থানীয় সরকারের সম্ভাবনাই বিনাশ করতে পারে।

তথ্য নির্দেশিকা

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০০); **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান**

আহমেদ, ড. তোফায়েল (১৯৯৮); **স্থানীয় সরকারের সংস্কার ভাবনার দুই দশক** (ভোলা : কোস্ট ট্রাস্ট) ।

আহমেদ, ড. তোফায়েল (২০০২); **শক্তিশালী স্থানীয় সরকার গণতন্ত্র, সুশাসন ও সুষম উন্নয়নের পূর্বশর্ত** (ঢাকা : রাজনৈতিক সংস্কার প্রচারাভিযান) ।

ইউনুস, ড. মুহাম্মদ (২০০২) ''স্বাধীন ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার হলে মাস্তানতন্ত্র টিকবে না'' (সাক্ষাৎকার) **প্রথম আলো** (৩ মার্চ ২০০২ খ্রি.) ।

করিম, জোবায়ের এনামুল (১৯৯১), ''বাংলাদেশের গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ'' **লোক প্রশাসন সাময়িকী,** ২য় সংখ্যা; (ঢাকা : বিপিএটিসি) ।

খান, আবু তাহের (২০০২), ''উপজেলা পরিষদে সাংসদদের ক্ষমতাদানের প্রশ্ন আসছে কেন?'' **সংবাদ** (১০ ফেব্রুয়ারী-২০০২ খ্রি.) ।

জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ (২০০২ক), ''স্থানীয় সরকার বিতর্ক : উপজেলা নিয়ে আলোচনা হোক'' **প্রথম আলো** (১২ মার্চ ২০০২ খ্রি.) ।

জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ (২০০২খ), ''উপজেলা, সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রের প্রভাবমুক্ত স্থানীয় সরকার'' **যুগান্তর** (৫ এপ্রিল ২০০২ খ্রি.) ।

বদিউজ্জামান, মোঃ (১৩৯৬), ''বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ : একটি সমীক্ষা'' **প্রশাসন সমীক্ষা,** ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, (ঢাকা: বিপিএটিসি)।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৮০)। **দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৮০-৮৫** (ঢাকা: বাপক)।

বিআরডিবি ও জাইকা, ২০০২, **পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা সফর প্রতিবেদন,** পার্টিসিপেটরী রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, (ঢাকা: বিআরডিবি)।

মজুমদার, ড. বদিউল আলম, (২০০২), ''স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের যৌক্তিকতা'' **উজ্জীবক বার্তা** (এপ্রিল ২০০২)।

মাশরাফী, ড. মখদুম (২০০২ক), ''সাংসদ বনাম স্থানীয় সরকার'' **যুগান্তর** (২৩ জানুয়ারী ২০০২ খ্রি.)।

মাশরাফী, ড. মখদুম (২০০২খ)। ''উপজেলা বিতর্ক : আইনজ্ঞ লবীর হেষ্টিংসীয় অবস্থান'' **ইত্তেফাক** (১২ মার্চ ২০০২ খ্রি.)।

মেনন, রাশেদ খান (২০০১), **সাপ্তাহিক ২০০০** (১৬ নভেম্বর ২০০১ খ্রি.)।

মোরশেদ, হেদায়েত হোসাইন (২০০২); ''স্থানীয় সরকার ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ ঃ প্রসঙ্গ সিটি করপোরেশন''; **আজকের কাগজ** (৩০ এপ্রিল ২০০২ খ্রি.)।

তালুকদার, মোঃ নাদিম (২০০২), ''তার চেয়ে ইউনিয়ন পরিষদ বিলুপ্ত করাই ভালো'' (চিঠি)' **ভোরের কাগজ** (১৯ জানুয়ারী ২০০২ খ্রি.) ।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট (২০০২), **উজ্জীবক বার্তা** (এপ্রিল ২০০২, ৪১ তম সংখ্যা)।

সিরাজুদ্দীন, মোহাম্মদ (২০০২), ''শাসন সংলাপ: কেন্দ্রীয় সরকার বনাম স্থানীয় সরকার'' **ইত্তেফাক** (১২ ফেব্রুয়ারী ২০০২ খ্রি.)

হক, রেজোয়ানুল (২০০২); ''উপজেলা পরিষদ গঠন চিন্তা স্থগিত'' **জনকণ্ঠ** (২৩ জানুয়ারী ২০০২ খ্রি.)।

Alderfer, Harold F. (1964). **Local Government in Developing Countries** (New York: McGraw-Hill Book Co.).

Ali, Quazi Azhar (1995). **Decentralized Administration in Bangladesh** (Dhaka : University Press Ltd.).

CPD, (2000). **Strenghening Local Government: Recent Experience and Future Agenda** (Dhaka : CPD).

Faizullah, M. (1982). "Zila Parishad in Bangladesh : A Case Study of Sylhet. **Journal of BARD,** Comilla, Hasnat Abdul Hye (ed) (1986)

Decentralization, Local Government Institutions and Resource Mobilization, (Comilla : BARD)

Faizullah, M. (1987). **Development of Local Government in Bangladesh** (Dhaka : NILG).

International Encyclopaedia of Social Sciences (1960). (New York: Macmillan Co.).

Quddus, Md. Abdul; Barua, Bijoy Kumar; and Ahmed, Tofail (Eds. 1995) **Participatory District Planning : A Framework for Action** (Comilla : BARD)

Rahman, Dr. Hossain Zillur (2002). "The Challenges of Decentralization" **The Daily Star** (25 March 2002).

Siddiqui, Kamal (ed) (1995). **Local Government in Bangladesh** (Dhaka: UPL).

Siddiqui, Kamal (2000). **Local Governance in Bangladesh : Leading Issues and Major Challenges** (Dhaka : UPL).

Zaman, M.Q (1989). "Ziaur Rahman: Leadership Styles and Mobilization Policies" **The Indian Political Science Review** Vol. XVIII, No. 2-3.

ISSN 1605-2021

LOK PROSHASON SAMOEEKY
Vol. 22,
March 2002/ Chaitra 1408

Civil Servants of Some Developed Democracies in a Comparative Vein

Kazi S.M. Khasrul Alam Quddusi [*]

Abstract: *Civil servants can be said to be the key personnel in a country's administration. Their upbringing, outlook and vision are supposed to have tremendous effect on their activities and demcanour towards the clientele in particular and the citizens at large. Basic traits of civil servants of the topmost developed democracies in the world viz. Great Britain, United States of America, France and Japan have been enlarged in this article in a comparative genre. These countries have well developed civil services alongside mature and almost equally competent political institutions. But the relationships among civil servants, political leaders and citizens therein are no less complex. Though not exactly synonymous, the words civil servants and bureaucrats have been used as interchangeable in this article.*

[*] Lecturer, Department of Public Administration, Chittagong University, Bangladesh

Britain: The social background of the civil servants in Great Britain has in the past shown very little diversity. Before 2nd world war there was literally monopoly of the 'Oxbridge' graduates but situation has improved a lot thereafter for the ones that do not belong to this cohort. Age restrictions for entry have been largely abolished and females now make up a third of those entering the first stream (Butler, 1993:403). Now 'Redbrick' universities provide a good number of graduates that are capable of qualifying for the civil service examinations (Heady, 1996:241). The civil servants in Britain enjoy a fair amount of latitude in terms of their job tenure but that does not emanate from legal provisions but from protective tradition. In Great Britain, organizations maintain their effectiveness by relying on the old patterns of deference that binds inferiors and superiors within the limits of necessary cohesion (Crozier, 1964:233). The civil servants are expected to remain neutral and anonymous in their activities though the idea of anonymity has been watered down greatly in recent years with widespread exposure of civil servants to various committees and the media (Greenwood and Wilson, 1989:87). British civil servants never had an extra burden on them to contribute to the stability of the political machinery as is the case in France and Germany nor do they have to deal directly with the public by providing goods and services but recent reforms want them to be more interactive with the public (Falconer and

Ross, 1999:348). British civil service is largely a closed one and it does not welcome experts and people form other sectors. The incumbents don't chase jobs in private sectors either (Christoph in Dogan, 1975:50). The civil servants play significant role in policy making but the exact extent is difficult to determine. The civil servants have a substantial share in the political decision-making in Britain but that doesn't border on monopolizing that. By temperament, socialization, situation, resources, top civil servants are well placed to strongly influence the outcome of public policy but hardly do they transform it into sole proprietorship (Ibid.). The British civil servants believe in the aphorism of responsiveness to their citizen and this very attribute has been generally put down to the representative nature of the polity for quite a long time. (Heady, 1996:245). British high fliers - the younger officials who are likely to be assigned major responsibilities later - are quite intense in being responsive to the citizens and they are the most politically conscious, the most programmatically committed, the most egalitarian, and the most tolerant toward politicians and pluralism (Putnam in Dogan, 1975: 117). Honesty of British civil servants is remarkable. Only one official out of half a million has been found guilty of corruption in forty years since 2nd world war. The rumour as to bribes and graft is almost non-existent. The bureaucracy is very much divorced from red tape, which is rife in many countries. The civil servants

write in plain English rather than in legalistic and formal English. It is easy to approach them and they are usually accommodating to the people. Tax inspectors and customs officers are rarely disagreeable. Citizens are not penalized if they are late with their tax returns (Birch, 1990:144-45). British civil servants as Sayre summarizes are more orderly and symmetrical, more articulate, more prudent, more cohesive and more powerful in comparison to their American counterparts (Sayre, 1964:223).

However, in recent years starting from Thatcher's regime, the governments have been a little reluctant to confide in the bureaucracy and steps have been taken to bring that under a cover of broader control. Thatcher's government undertook the steps to emphasize managerial role of civil servants and weed out the bureaucrats that leak information and are not committed to the service. Loyalty to the party has been regarded as a plus point for the bureaucrats and the Thatcher government has whittled bureaucrats' role in policy making down considerably and accelerated a post war trend to appoint political sympathizers to advisory positions in line with political appointees in U.S.A. and ministerial cabinets in France. The successive governments were expected to follow suit (Kingdom, 1990:23). And that has been the case. Notwithstanding this shift in the governments' outlook, the

service orientation, competence, professionalism of the civil servants remain almost unscathed (Heady, 1996:247).

U.S.A.: As the American society is basically open and methods of civil service advancement are uniform, the upper echelons of the bureaucracy are, by and large, representative of the society though representation of black and women in the higher ranks is still a problem (Ibid, 1996:250). Affirmative action, however, has achieved some success in lessening that problem. As in Britain, the permanence of job depends on a protective tradition rather than legal safeguards. The civil servants are subjected to significant restrictions as to their participation in partisan political activities. They are, however, entitled to vote and express their political opinions. In the USA, organizations must use impersonal rules in order to achieve cohesion (Crozier, 1964:233). In contrast with Great Britain and continental Europe, interchange of careers in governmental and non-governmental organizations continues to be quite feasible and encouraged under the existing personnel practices though it weakens expertise, continuity and stability. Bureaucratic policy makers in the US must operate much more in public eye, which gives them more leeway, but at the same time involves greater risks. The relationship between the top career man and his political superior is rather vague. The civil servants are called on to defend their agencies position in many cases. But no clear line of demarcation between career and political executives exists in law, regulations, policy or tradition. The simultaneous presence of career administrators and political executives in top

posts presupposes a reciprocal relationship between them and that is very much present in the U.S.A. to lend sustenance to its administration. Instead of behind-the-scenes activity, as in Britain, the Americans want their bureaucrats to be more open to the public with the inevitable reactions that follow whether favourable or unfavourable. The American civil servant who earns high and lasting prestige in his society is usually one who most completely breaks the mask of anonymity and becomes a public figure (Sayre, 1964:228). Bureaucrats of America exercise substantial power but within defined framework of the agencies they work. They are neither willing nor able to consolidate bureaucratic power across the board. American bureaucrats have neither the motivation nor the capacity to stage a coup and seize power (Riggs, 1994:67). Riggs also claims that America has a unique political and administrative system, which has kept its bureaucracy weak enough not to be able to seize power but strong enough to administer reasonably well (ibid, 1998:27). The American bureaucrats are a more internally competitive, a more experimental, a noisier and less coherent, a less powerful but a more dynamic one in comparison to their British counterparts (Sayre, 1964:223). Bureaucratic usurpation and unresponsiveness was less a reality than a complaint. Americans were not really apprehensive about or dissatisfied with public administrators but they wouldn't like to admit that. The image of bureaucracy is, however, not that rosy these days. In recent years, the endemic distrust of government in the United States has heightened because public administrators and politicians have failed to solve a phalanx

of social and economic problems. Bureaucracy-bashing has become a common phenomenon in the United States. Businesses are critical of public bureaucracy for hindering corporate activities by forcing rigid rules and regulations upon them. Citizens think that government is spending tax dollars inefficiently while societal problems remain unsolved (Jun and Muto, 1995:132).

France: About 40 percent of the entrants into grand corps continue to come from family background in the civil service, mostly in higher ranks. Democratization of civil service has not occurred mainly because access to higher education continues to be primarily confined to students from upper-middle-class origins, with a heavy concentration of graduates from Paris rather than from provinces. This is France's equivalent to the public school / Oxbridge bias which is so often criticized in Britain (Owen in Kingdom, 1990:76). The recruitment system is closely geared to the education system, so that access to the higher civil service is restricted to those who also have access to higher education. France is undoubtedly a highly elitist society but it probably causes less heart-searching in France than in Britain because it is, at the same time, much less of a snobbish society than British society (Ibid.). Frenchmen are less worried about the fact that an elite exists, as long as its members are competent. In France, the civil service is an important and highly sought after channel of social ascent but entry into the civil service especially in its higher rank is not easy. The civil service is a career service ordinarily chosen early in life and pursued to retirement, with slight movement of individuals into and out of administrative corps in

mid-career (Heady, 1996:208). The French civil servants enjoy security of tenure on a lifetime basis, subject only to the unlikely loss of job on the basis of redundancy in which case compensation is provided. The remuneration is adequate but not lavish. Promotions and other changes in status are controlled in large measure by the civil service itself. Most civil servants are free to join political parties and take part in party activities. Those in positions of responsibility are not barred but are not supposed to disclose their civil service status or make use of information acquired because of their official assignments. Civil servants may become candidates for elective offices, and may serve in most local offices without giving up active duty but if they run and get elected to the national legislature, they must go on inactive status during the term of service, with a right to return later (Ridley and Blondel, 1969:50-51). French bureaucrats take an active and crucial part in public policy making; ultimate control lies, however, outside the bureaucracy. During the fifth republic bureaucratic participation in public policy making has been really impressive but it never amounted to appropriation of power (Vernardakis, 1988:447). In initiating changes, however, they cannot be prime movers like their Japanese counterparts (Crozier, 1964:255). Subordination to the dual executive - the president and the prime minister - has, however, weakened its autonomy to a degree but, by the same token, that has enhanced its ability to adjust. Bureaucrats of France had always a stabilizing effect on its lingering political instability. Before induction of fifth republic, French was a very unstable society with delicate political

institutions but its bureaucracy gave monolithic support to its steadiness and that's why it is said about French that the republic passes but the administration remains. In France, the view has taken deep roots that the political parties in power represent the government but civil service is the servant of the state. This view places the civil service under a solemn obligation to remain independent and impartial in its functioning (Maheshwari, 1997:86). Civil servants selected through a long-drawn-out screening process leave a stamp of their efficiency and impartiality on their work, which endears them all the more to the French society. French society at large treats its civil servants with respect, for it thinks that its interests are safe in the hands of the mandarins (Ibid, p.87). French civil servants are present almost everywhere. While British civil servants are concentrated in the capital and in large cities, their French counterparts are deployed all over the country (Ridley and Blondel, 1969:29). The field services or the external services of the central government have always been numerous. Their presence in the crucial institutions is virtually ubiquitous which distinguishes them from other civil services. Remarkably, all 11 prime ministers of France up to 1991 were civil servants and this speaks volumes for civil servants prominence in French politics (Rohr, 1991:287) and accordingly, France is rightly called the paradise of modern mandarins (Dogan, 1975:11).

Japan: In the Japanese civil service, all parts of Japan are, by and large, represented although with disproportionately large number of members from town and cities, particularly Tokyo. A

majority comes from middle class origins and eminent families are somewhat over represented. Sex discrimination, however, continues to deny women in equal opportunities in employment generally, including entry into the civil service (Heady, 1996:258). The proportion of women representation is, however, showing upward trend these days. (Sakamoto in Farazmand, 1991:119-122). The number of civil servants is relatively less in Japan compared to other developed democracies. It can be inferred from the fact that there were 40 public employees for every 1000 members of the population, compared to 120 in France, 81 in United States and 80 in the United Kingdom in 1991 (Masujima, 1997:247). The civil service of Japan is highly elitist, drawn as it is from a rather narrow educational base. Its members mostly come from ten or so universities, most of them national ones and nearly half from a single faculty, that is, law. The public sector employment system is closely structured to the educational pattern, which has the effect of making it a close-door system. Employment at an early age is the practice in Japan and it is neither common nor acceptable to change employees. Employment generally lasts for a lifetime (Tsuzi, 1984:53). Most join between the ages of 22-23 or just fresh from the university. In U.S.A. and Canada, persons of higher age with work-experience in more than one organization tend to join the civil service (Maheshwari, 1997:105). The elitism is, however, not a source of

contention as that is sufficiently neutralized by indigenous social mores. Historically and emotionally, Japanese society is a highly homogenous and reciprocative one bounded together by a network of understandings, obligations, duties and responsibilities and each member is expected to be governed by those. It requires to be noted that most suicides are committed in Japan for perceived violation of these unwritten codes (Ibid.). Elitism is further moderated by the economic development of the society with the middle class constituting eighty five percent of the population. Japanese are very emotional as to their idiosyncratic cultural norms and politeness. When a Japanese official speaks to a foreign official, he or she may speak at a very high level of politeness and the counterpart is expected to reciprocate in the same manner. A slight deviation might cause serious problems. As a result, the foreigners have to be familiar with wide range of politeness in place in Japan, which is rather an arduous task for them. In organizational relationships, use of proper language and verbal expression is a must. If a client fails to use proper expression, a government employee may interpret that as lack of respect and may be indifferent to the client and fail to help (Jun and Muto, 1995:130). The philosophy of Confucius and groupism has consistently fashioned their orientation; the passion for individualism is, however, catching on these days. (Ibid, p.134) The Japanese bureaucracy is deeply absorbed in making political

decisions and may become involved in active political life. Actually, the demarcation line between politicians and officials is not at all important in Japan (Heady, 1996:260). In Japan at the higher levels this distinction has not always been evident as the same officials discharged political and bureaucratic functions most often. In Japan, active career bureaucrats often hold positions and carry out functions usually reserved for political appointees in other countries. More importantly, the elitist status of higher civil servants is retained after they retire, giving them better prospects for postretirement placement than are usually available to their counterparts in Great Britain or the United States. In addition to joining other lucrative organizations, their inclusion in the cabinets is not negligible. The effectiveness and efficiency of the higher civil service are independent of political ideology. The bureaucracy has functioned with relative success under all sorts of governments to date and that speaks for its tremendous amount of resilience and adaptability (Kubota quoted in Heady, 1996:261). There seems to be some similarities between French and Japanese civil service but unlike French bureaucracy which main function is to maintain law and order in a rebellious society, Japanese bureaucratic power has a decisive role as a prime mover (Crozier, 1964:231). The political weight of the Japanese civil service has been greater than that of other political actors including Parliament, parties and the interests groups. Williams is emphatic

in depicting the true colour of Japanese bureaucracy. In his words, the bureaucracy has normally dominated the legislative process, and in this narrow sense can be said to have ruled while the Diet reigned (quoted in Heady, 1996:265). This supremacy is likely to increase in future. So, in terms of power Japanese bureaucracy is always a cut above other developed bureaucracies. The image of bureaucracy is quite contrary to that of American bureaucrats. Japanese bureaucracy is able to maintain its image of being honest, responsible and fair. Because of this, citizens believe that government is reasonably efficient, responsive, competent, and protective of lives of citizens (Jun and Muto, 1995:132). There is, however, strong tide for reforms in Japan in the wake of political corruption, rising deficit and tax cuts, but bureaucracy and ruling political party have been alleged to have formed a clique to thwart the reform moves (Ibid, 1998:195).

References

Birch, Anthony H. (1990). **The British System of Government.** (8th ed). London: Unwin Hyman.

Butler, Robin (1993). **The Evolution of the Civil Service - A Progress Report.** Public Administration 71(Autumn): 395-406.

Crozier, Michel (1964). The Bureaucratic Phenomenon. Chicago: University of Chicago Press.

Dogan, Mattei (1975). (ed). **The Mandarins of Western Europe.** New York: Wiley and Sons.

Falconer, Peter K. and Ross, Kathleen (1999). **Citizen's Charters and public service provision: Lessons from the UK experience,** International Review of Administrative Sciences 65 (3): 339-351.

Farazmand, Ali (1991). (ed). **Handbook of Comparative and Development Administration .** New York: Marcel Dekker.

Greenwood, John and Wilson, David (1989). (eds). **Public Administration in Britain Today.** 2nd ed. London: Routledge.

Heady, Ferrel (1996). **Public Administration A Comparative Perspective.** (5th ed). New York: Marcel Dekker.

Jun, Jong S. and Muto, Hiromi (1995). **The Hidden Dimensions of Japanese Administration: Culture and Its Impact.** Public Administration Review 55(2): 125-134.

________ (1998). **The politics of Administrative Reform in Japan, more strategies, less progress,** International Review of Administrative Sciences 64(2): 195-202.

Kingdom, J.E. (1990). (ed). **The Civil service in Liberal Democracies an Introductory Survey.** (2nd ed). London and New York: Routledge.

Maheshwari, S. R. (1997). **Major Civil Service Systems in the World.** New Delhi: Vikas Publishing House Ltd.

Masujima, Toshiyuki (1997). **Controlling the size of the Japanese public service**, International Review of Administrative Sciences 63(1): 247-250.

Ridley, F and Blondel, J. (eds). (1969) **Public Administration in France.** (2nd ed). London: Routledge and Kegan Paul.

Riggs, Fred W. (1994). **Bureaucracy and the Constitution.** Public Administration Review 54 (1): 65-72.

(1998). **Public Administration in America: Why Our Uniqueness is Exceptional and Important.** Public Administration Review 58(1): 22-31.

Rohr, John A. (1991). **Ethical Issues in French Public Administration**, Public Administration Review 51(4): 283-297.

Sayre, Wallace S. (1964). **Bureaucracies: Some Contrasts in Systems**, Indian Journal of Public Administration X (2): 219-229.

Tsuzi, Kiyoaki (1984). **Public Administration in Japan.** Tokyo: University of Tokyo Press.

Vernardakis, George (1988). **The National School of Administration and Public Policy Making in France,** International Review of Administrative Sciences 54(4): 427-451.

ISSN 1605-2021

লোক প্রশাসন সাময়িকী
দ্বাবিংশতিতম সংখ্যা,
মার্চ ২০০২/চৈত্র ১৪০৮

ব্যবসার সামাজিক গুরুত্ব ও নৈতিক দায়বোধ প্রসঙ্গঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

এ,এস,এম, আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া*

Context of Social and Moral Responsibility of Business: Bangladesh Perspective

A.S.M. Anowarullah Bhuiyan

Abstract: *Business organizations are considered as inseparable parts of a modern society. This is due to fact that 'business' is a major social institution, and as such it is seriously interwoven with social norms and customs. As a social system business firm and its activities influence the social fabric. And it also exerts considerable influence on the general well-being of society. Every society desires that business firms are socially responsible to preserve the interest of consumers. Business activities are morally obliged to be honest, fair and impartial in dealing with customers. It must play a vital role in improving the standard of living of people of society and it should exercise a greater role in solving the social problems. That is why business-ethicists demand that every business organization must consider social values and*

---

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

morality as potential content for taking decisions. But in many cases we have observed that many business-holders or organizations ignore the moral responsibility towards society, and seek excessive profit. Some of such unfair and unethical means are: exploiting labour, deceiving consumers by adulteration, under-weighing and cheating advertisement, evading and avoiding taxes and violating the rules and regulations of ethical code. In Bangladesh the scenario of moral responsibility of business firms are deplorable. Most of them are found to be unethical and irresponsible towards consumer, shareholder, employee. That is why most of the people in Bangladesh do not have enough conficence in our business firms. To overcome that problematic situation every business firm need to increase the moral commitment and responsibility towards the social group. In this paper we suggest that business firms must behave ethically for the interest of society in the large scale. In view of this, we have discussed the nature of business ethics, social and moral responsibility of business, content of morality in the different sectors of business and the unethical scenario of business in Bangladesh.

ভূমিকাঃ

মানুষ তার নিজস্ব চাহিদা, নিরাপত্তা, অভাব বা প্রয়োজনের কারণেই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এই নির্ভরশীলতার প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে মানুষ সমাজ সৃষ্টি করেছে। আর এই নির্ভরশীলতাই হলো সামাজিক মানুষের আচরণের বহিঃপ্রকাশ। এই আচরণ যেন ব্যক্তিস্বার্থকে ব্যহত করতে না পারে, কিংবা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে অস্থিতিশীলতা, সহিংসতা, অরাজকতা, বৈষম্য কিংবা নৈরাজ্যের সৃষ্টি করতে না পারে তা বিবেচনায় রেখে মানুষের নৈতিক জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যমান বিভিন্ন সঙ্কট ও সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষ তার অর্জিত নৈতিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছে এরই উপর ভিত্তি করে জ্ঞানের একটি নতুন শাখা সৃস্টি হয়েছে- যা ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা নামে পরিচিত। আমরা জানি যে, দ্রব্যের সঙ্গে মুদ্রার কিংবা দ্রব্যের বদলে দ্রব্যের লেনদেন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াটি জড়িত। বর্তমান সময়ে 'ব্যবসা' বলতে বুঝায় দ্রব্য, উৎপাদন ও মুনাফার বিনিময়ে অপরের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে দ্রব্যটিকে ভোক্তার নিকট হস্তন্তর করা। কিন্তু সমসাময়িক বিশ্বে ব্যবসার ক্ষেত্রে মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারণা, অথবা শিল্পের ক্রমপ্রসারের ফলে প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কারণে ব্যবসার ক্ষেত্রে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, প্রতারণা, ঠকবাজি, অনিয়ম ও অসমতার অনুপ্রবেশ ঘটছে। অর্থাৎ ব্যবসার চিরাচরিত ধারণা 'সেবা'র দিকটি বিবেচনা না করে মুনাফাকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ফলে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'ব্যবসা'য় অনুপ্রবেশ ঘটছে ধাপ্পাবাজি, প্রতারণা, ও ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতা। আর এভাবে ব্যবসা একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে খুইয়ে বসছে এর সামাজিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতা। এ দায়বদ্ধতাকে সামাজিক কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করার প্রেক্ষাপট থেকেহৈ ব্যবসায় নীতিবিদ্যা'র প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধে এ বিষয়গুলোকে স্পষ্ট করার জন্য ব্যবসায় নীতিবিদ্যার স্বরূপ আলোচনা করা হবে এবং বর্তমান বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই সঙ্কটের একটি চিত্র উপস্থাপনের ভিত্তিতে ব্যবসার সামাজিক নৈতিক দায়বোধের প্রসঙ্গটি উত্থাপনের প্রয়াস থাকবে।

ব্যবসার সামাজিক গুরুত্ব ও নৈতিক প্রসঙ্গঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

এ,এস,এম, আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া

এক

ব্যবসা কি?

ব্যবসা বলতে একধরনের 'ফিডব্যাক সিস্টেম' কে (চার্চম্যান, ওয়েষ্ট, ১৯৭১) বুঝানো হয়, যে প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত উপাদান হল পুঁজি, মালিক, শ্রমিক বা কর্মজীবী, ভোক্তা এবং বাজারজাতকরণ। একজন ব্যবস্থাপক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য যোগান দেন সামর্থ্য, কৌশল, জ্ঞান-বুদ্ধি ও পরিকল্পনা, আবার ভোক্তা যোগান দেন- প্রয়োজনীয় অর্থ, যার সাহায্যে প্রতিষ্ঠান শ্রমমূল্য, উৎপাদন খরচ সরবরাহ করে মুনাফা অর্জন করে থাকে। এভাবে দেখা যায় যে, ব্যবসার প্রত্যেকটি উপাদান পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। নিম্নের ছকের সাহায্যে এই নির্ভরশীলতাকে দেখাতে পারিঃ

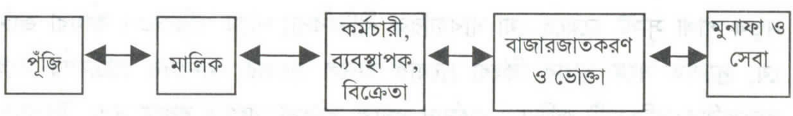

ব্যবসার লক্ষ্যঃ

১. প্রতিষ্ঠান মালিকের দৃষ্টিতেঃ ব্যবসার লক্ষ্য মুনাফা অর্জন এবং পুঁজির স্ফীতকরণ।

২. প্রতিষ্ঠানের কর্মজীবীর দৃষ্টিতেঃ ব্যবসার লক্ষ্য হল প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত শ্রমমূল্যের সহায়তায় সুন্দর জীবন যাপন নিশ্চিতকরণ।

৩. ভোক্তার কাছেঃ ব্যবসার লক্ষ্য হল গুণগত মানসম্পন্ন দ্রব্য সরবরাহ এবং ভাল সেবার নিশ্চয়তা প্রদান করা।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উপাদানের পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করলে ব্যবসার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ভিন্ন রকম পরিলক্ষিত হবে। অনেকটা অন্ধ ব্যক্তিদের হাতি দর্শনের মতো। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে, পাবলিক পলিসির ভিত্তিতে প্রকৃত অর্থে ব্যবসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে নির্ধারিত নিয়মকানুনসমূহ ব্যবসা প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত উপাদানসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণ করে থাকে। এজন্য অনেক দাবী করেন সামাজিক সুখ-সাচ্ছন্দের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে ব্যবসার উদ্দেশ্যসমূহ।

ব্যবসা ও মূল্যবোধঃ

ব্যবসা একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এটি নিজে মূল্যবহির্ভূত হলেও এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তির মূল্যবোধ দ্বারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কারণ নাগরিক হিসেবে আমরা সকল সময় লক্ষ্য করি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ কি করছে? কিংবা এর পরিচালকগণ কিভাবে ভাবছেন? প্রত্যেক ব্যবসায়ী নেতৃত্বের লক্ষ্য হওয়া উচিত কোন মূল্যবোধটি ব্যবসা পরিচালনার জন্য 'মঙ্গলজনক' বা 'কল্যাণকর' তার প্রতি দৃষ্টি রাখা। মূল্যবোধের কয়েকটি মাত্রাও আমরা এ প্রসঙ্গে ভাবতে পারি, যেমনঃ

এক. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জনের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নেতার মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কেননা 'ব্যবসা' প্রত্যয়টিকে যদি ধরা হয় 'সমমাত্রিক পদ্ধতি' হিসেবে, এবং এর উপাদানসমূহ যদি পরস্পর নির্ভরশীল হয় তাহলেই কেবল বলা যাবে এর নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তির মূল্যবোধ এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

দুই. সহজ বিবেক বিচারবাদী নৈতিকতা (Casuistry) অনুসারী দার্শনিকগণ সর্বপ্রথম ব্যবসার সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। ক্যালভিন ক্যাথলিক ধর্মতাত্ত্বিক সংস্কারের বিরোধীতায় রাজনৈতিক ভাবনার ক্ষেত্রে এরকম নৈতিকতার প্রস্তাব করেন। বিশেষত সামাজিক কর্তব্যবোধের ধারণাকে কেন্দ্র করে সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এধরনের নৈতিকতার অনুশীলন নিশ্চিত হতে থাকে। ব্যবসার ক্ষেত্রে সহজ বিবেক বিচারবাদী নৈতিকতার অনুশীলনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ব্যবসায় নীতিবিদ্যা'- যা ভিন্ন অর্থে ব্যবসার ক্ষেত্রে মূল্যবোধের নতুন সংযোজন।

ব্যবসার সামাজিক গুরুত্ব ও নৈতিকতা

মানব-সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে; ব্যবসা সংগঠন তন্মধ্যে অন্যতম। শিল্প বিপ্লবের পূর্বে ব্যবসা-বাণিজ্যের মূল লক্ষ্য ছিল লগ্নীকৃত পুঁজিকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা। এ সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মুনাফা অর্জনের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছিল। এরই ফলে ইউরোপে প্রণীত হয়েছিল 'Caveat Emptor' নামক বিক্রয়নীতি। এই আইনের কারণে বিক্রেতা ইচ্ছেমাফিক ক্রেতাকে ঠকাতে পারতো (মান্নান, আব্দুল, ১৯৮৬: ৪৯৩)। কিন্তু কালক্রমে ব্যবসা

প্রতিষ্ঠানসমূহের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায়, প্রতিযোগিতা এবং পণ্যচাহিদার মাত্রাও বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর এভাবে 'Caveat Emptor' নীতিটি সামাজিক দায়িত্ববোধের অবেদন হারিয়ে ফেলে, এরই ধারাবাহিকতায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। সাম্প্রতিককালে ব্যবসার সামাজিক দায়িত্ব একটি আলোচিত বিষয়। সমাজ এবং রাষ্ট্রভেদে এই দায়িত্বের ভিন্নতা লক্ষ্য করার মতো- কল্যাণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যবসায়ী কখনো সামাজিক সমস্যা, অথবা ভোক্তার সমস্যাকে তুচ্ছ করে দেখেন না। রাষ্ট্র তথা জাতি ভেদে ব্যবসা সম্পর্কিত ধারণা ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন, উন্নতদেশে ব্যবসা সম্পর্কিত ধারণা এবং অনুন্নতদেশের ব্যবসা সম্পর্কিত ধারণা এক নয়। যেমন, ইউরোপের মুক্ত বাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যবসার মূল নীতি হল- "লাভের সর্বোচ্চকরণ করা"- এখানে সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কিত কোন দর্শনই কার্যকর নয়, তাদের কাছে ব্যবসার অর্থই 'ব্যবসা'। আবার অনুন্নত দেশে ব্যবসা সম্পর্কিত ধারণাটিই স্পষ্ট নয়। ফলে লক্ষ্য করা যায় উভয় সামাজিক ব্যবস্থায় ব্যবসায়িকগণ সমাজের প্রতি কোন বাধ্যবাধকতা কিংবা দায়িত্ব কর্তব্যের দায় নিতে চান না। কিন্তু একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বৃহত্তর সামাজিক প্রক্রিয়ারই অংশ। 'সমাজ' নামক দেহের একটি হল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং এর কার্যক্রমসমূহ সামাজিক কৌশল দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে থাকে। এজন্য বলা হয় ব্যবসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বৃহত্তর সামাজিক প্রক্রিয়া থেকে নিঃসৃত। সমাজের উৎপত্তি প্রসঙ্গে দার্শনিক বিশ্লেষণের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এ বিষয়টির সত্যতা আরো স্পষ্ট করা যায়। সমাজের উৎপত্তি প্রসঙ্গে দার্শনিকদের বক্তব্যের মূলকথা হল- সর্বজনীন ইচ্ছা এবং চুক্তির ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর সর্বজনীন ইচ্ছা এবং চুক্তির ভিত্তিমূলে রয়েছে মানুষের প্রতি মানুষের দায়বোধ, ঐক্য ও সংহতি। সুতরাং সামাজিক নৈতিকতার মূল লক্ষ্য হিসেবে ঐক্য ও সংহতিকে ভাবতে পারি। প্লাটোনিক দর্শনে এই শব্দগুচ্ছই 'ন্যায়পরায়ণতা' হিসেবে আদৃত হয়েছে, যা প্রসঙ্গে প্লেটো বলেন-

> "Justice is the virtue which remains in the state when the other virtues of temperance and courage and wisdom are abstracted; and is the ultimate cause and condition of the existence of all of them." (Plato: 433)

প্লাটোনিক ন্যায়পরায়ণতার মূলকথা হল সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ না করে নিজের কাজ করবে। তিনি ন্যায়পরায়ণতাকে সমাজের আত্মা এবং সমাজকে ন্যায়পরায়ণতার দৃশ্যমান বাস্তবায়ন বলে ভেবেছেন। সুতরাং

ন্যায়পরায়ণতা ব্যতীত সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। এ হিসেবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে যদি সামাজিক সংগঠনের একটি অংশ হিসেবে ধরা হয়- তাহলে সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা বাস্তবায়নে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেরও কতগুলো নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে।

হারগ্রেক্স এবং জে. ডানমেন (১৯৭৫:১৬-২১) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তিন ধরনের দায়িত্বের কথা বলেনঃ ক. মৌলিক দায়িত্ব, খ. প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব এবং গ. সামাজিক দায়িত্ব। পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'কমিটি ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট' (সংক্ষেপ সিইডি) এই সামাজিক দায়িত্বকে ত্রিমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন। সেগুলো হলঃ ক. আন্তঃবৃত্তিক দায়িত্ব খ. মধ্যবৃত্তিক এবং গ. বহিঃবৃত্তিক দায়িত্ব। সেগুলো সংক্ষেপে নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলঃ

আন্তঃবৃত্তিক দায়িত্ব

১. পণ্যের গুণগতমান ক্রেতাসাধারণের প্রত্যাশা অনুযায়ী বজায় রাখতে হবে।

২. পণ্যের উৎপাদন খরচের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মুনাফা অর্জন করতে হবে।

৩. অর্থনৈতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৪. ভোক্তার চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে।

মধ্যবৃত্তিক দায়িত্ব

১. সমাজের পিছিয়ে পরে থাকা অনগ্রসর অনুন্নত জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেন পরিবেশ দূষণের কারণ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩. শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং বিদ্যমান পরিবেশের পরিবর্তনশীল মূল্যবোধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

বহিঃবৃত্তিক দায়িত্ব

১. রাষ্ট্রীয় সমস্যাসমূহের সমাধানে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে হবে।

২. রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে পরোক্ষভাবে হলেও সহায়তা করতে হবে।

৩. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন কারিগরি-বিদ্যালয়, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং সমাজের অদক্ষ জনশক্তিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলার কাজে সহায়তা করতে হবে। এইচ. আর বাউন (১৯৯৪) বলেন, প্রত্যেক ব্যবসায়ির সামাজিক দিকটি বিবেচনায় রেখে ব্যবসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। কারণ ব্যবসার মাধ্যমেই সামাজিক লক্ষ্যের উচ্চতর পর্যায়সমূহ যেমন, সঙ্গতিপূর্ণ জীবন-যাপন, অর্থনৈতিক প্রগতি, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ব্যক্তিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা অর্জন করা সম্ভব। এভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পারে নাগরিক স্বার্থকে সমুন্নত করতে।

আর্নেষ্ট ডালি (১৯৮৫) দাবি করেন ব্যবসার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিতঃ

১. অংশীদারের গচ্ছিত অর্থ ও মুনাফার যথাযথ বন্টন করা।

২. শ্রমিক-কর্মচারীদের যথাযথ কাজের শ্রমমূল্য নিশ্চিত করা।

৩. যোগানদাতা, বন্টনকারী ও ভোক্তাদের সঙ্গে যথাযথ আচরণ করা, এবং

৪. ব্যবসাকে স্থানীয় জনগণ এবং জাতির জন্য একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপদান করা।

সুতরাং তাঁদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হল একধরনের সামাজিক সংগঠন, যা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য সমকালীন অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন, ব্যবসাকে যদি কল্যাণ ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রূপান্তরিত করা যায় তবে তা সমাজের ইতিবাচক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে পারবে।

ব্যবসায় নৈতিকতাঃ

ব্যবসায় নৈতিকতা বলতে কি বুঝায় তা আলোচনা করতে হলে প্রথমে ব্যবসা ও নৈতিকতা কি তা আমাদের জানা প্রয়োজন। ব্যবসা প্রাচীনকালে মুলতঃ মানুষের 'primary motivation' এর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। তখন মানুষ দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য লেন-দেন করত। এরপর ব্যবসা সম্পর্কিত হয় 'secondary motivation' এর সঙ্গে। এখানে মানুষ দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের নির্ধারক হিসেবে মুদ্রার প্রচলন করে। তারা টাকা পয়সার মাধ্যমে লেন-দেনের প্রক্রিয়া চালু করে এবং মানুষের বিভিন্ন

ধরনের সুযোগ সুবিধার দিক লক্ষ্য রাখত। কিন্তু আধুনিককালে ব্যবসার গতি-প্রকৃতি মূলত অর্থের জন্য অর্থ লাভের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে, সুযোগ-সুবিধার দিকটি এখানে কমই গুরুত্ব দেয়া হয়।

সাধারণত ব্যবসা বলতে বুঝায় অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে উৎপাদিত দ্রব্যের সাহায্যে (অর্থের বিনিময়ে) লেন-দেন করা। ব্যবসার সঙ্গে অর্থের নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি নীতিবিদ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যবসার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্প্রাইজেল বলেন-

"The businessman produces goods and services for his customers with the hope of earning a profit by efficient operation. A profit in the business sense in the difference between the selling price of a good on service and its total cost.... In addition to enjoying business may businessman have an abiding faith and conviction that they are serving mankind. This concept of service is one of the characteristics os business." (Spriegel, 1962, P-1)

সুতরাং আধুনিক কালে ব্যবসা বলতে বুঝায়- দ্রব্য উৎপাদন ও মুনাফার বিনিময়ে অপরের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তা অন্যের নিকট হস্তান্তর করা। অপরদিকে নীতিবিদ্যা হলো, সমাজে বসবাসরত মানুষের আচার-আচরণ সম্পর্কিত মূল্যায়নমূলক (ভালত্ব/মন্দত্ব) আলোচনা। নীতিবিদ্যা কতগুলো আদর্শের ভিত্তিতে মানব আচরণের মূল্যায়ন করে থাকে। মানুষের আচরণ ভাল কি মন্দ তা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে নীতিবিদ্যা একটি সুস্পষ্ট আলোচনা দাঁড় করিয়ে থাকে।

ব্যবসায় নৈতিকতা হল সমাজে বসবাসরত মানুষের লেন-দেনের আচারণ সম্পর্কিত এক বিশেষ ধরনের আদর্শ। মানুষ সর্বদা তার নিত্য প্রয়োজনসমূহ মেটানোর জন্য পরস্পরের সঙ্গে লেন-দেনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে থাকে। এই সম্পর্ক ভাল কি মন্দ তা মূল্যায়ন করাই হলো নীতিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই আমরা বলতে পারি, ব্যবসার ক্ষেত্রে মানুষের আচরণের মূল্যায়নমূলক আলোচনাই 'ব্যবসায় নৈতিকতা'। অর্থাৎ দ্রব্য উৎপাদন ও তা অন্যের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উৎপাদক অর্থের বিনিময়ে লেন-দেন করেন, এই লেন-দেনের সম্পর্ক ভাল কি মন্দ, কিরূপ ব্যবহার দাতা গ্রহিতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিৎ, তা আলোচনাই ব্যবসায় নীতিবিদ্যার কাজ।

একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যবসায় নীতিবিদ্যার ধারণাটিকে স্পষ্ট করা যেতে পারে, যেমন কোন ক্রেতা কোন ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে একসেট টেলিভেশন পছন্দ করলো তার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য। তারপর কার্টনে বাঁধাই করা টেলিভিশনটি ক্রেতার ব্যবহারের জন্য ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরের উদ্যোগে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এখানে ক্রেতার প্রত্যাশা হলো কার্টনের উপর উল্লেখ্য শর্তাবলী, মাপ, ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের টেকসই গুণাবলী হুবহু টেলিভিশন সেট্‌টিতে থাকবে। আবার ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরের প্রত্যাশা হলো তার প্রত্যাশিত মূল্য যেন ক্রেতা পরিশোধ করেন। এই পারস্পরিক অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার বিনিময়যোগ্যতা ব্যবসায় নীতিবিদ্যা ও ব্যবসায় আইনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি- ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি-নিয়ম, আদর্শ এবং এর অনুশীলন যা আমাদের নৈতিকতা এবং সদাচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত- সে বিষয়ের আলোচনা হলো ব্যবসায় নীতিবিদ্যা। অর্থাৎ নীতিবিদ্যা ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি নিয়ম কানুনগুলো ব্যক্তি অপেক্ষা গণমানুষের জন্য কোনটি উচিত বা অনুচিত, ভাল বা মন্দ, কামনা যোগ্য বা কামনার অযোগ্য তা নির্ধারণ করে থাকে। একজন ব্যবসায়ী বা বিক্রয়কর্মী তার মূল দায়িত্ব হল ব্যবসায়িক ভূমিকা পালন করার মাধ্যমে 'ভাল ব্যবসায়ী হওয়া'। একই ব্যক্তির আরো কতগুলো ভূমিকা পালন করতে হয় যেমন, বন্ধুত্বের ভূমিকা, পারিবারিক সদস্য ও নাগরিক হিসেবে ভূমিকা ইত্যাদি। কিন্তু ধরা যাক, একজন ব্যবসায়ীর বন্ধু তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সুনাম, অর্থ বা মূলধন বিভিন্নভাবে অপচয় করছে- সেক্ষেত্রে ঐ ব্যাবাসায়ির তার সঙ্গে কি বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করা উচিত? এমতাবস্থায় একজন ব্যবসায়ী কিভাবে আচরণ করবে? কিংবা একজন ব্যবসায়ী মুনাফা অর্জনের জন্য যদি কোন ক্ষতির কারণ হয় তবে কি তাকে হত্যা করতে হবে? কিংবা বন্ধুকে চাকুরি থেকে অব্যাহতি দেবে? এসব সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায়? অথবা এ ধরনের বিরোধ কি আদৌ সমাধানযোগ্য নয়। উপর্যুক্ত সমস্যাটি আমরা তিনটি দিক থেকে বিবেচনা করতে পারি। এই তিনটি বিবেচনা দ্বারাই স্পষ্ট হবে ব্যবসার সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক কি?

প্রথমতঃ নীতিবিদ্যার সিদ্ধান্ত দিয়ে ব্যবসার ক্ষেত্রে এই জটিলতা সমাধান করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে অনেকে অস্বীকার করেন নীতিবিদ্যা দ্বারা ব্যবসায় বিদ্যমান সমস্যার কিছুই করা যায় না। এ ধরনের মতাদর্শীদের ব্যবসার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হল- "Business is business and should not mixed with ethics." (Bowie & Duska, 1960:17) এধরনের মতাদর্শীদের বিবেচনা হল- "When the Rome do as the Romans do"- এ রকম বিশ্বাসের কারণে তাঁরা বলেন,

তোমরা যখন কাজ কর কিংবা বন্ধুর প্রতি বাৎসল্য জানাতে ব্যস্ত থাকো তখনো ব্যবসায়ে মনোযোগী হবে। কিংবা অন্য কোন নৈতিক কাজে মনোনিবেশ করলেও ব্যবসার প্রতি মনোনিবেশ রাখতে হবে। অর্থাৎ ব্যবসা এবং নৈতিকতা পৃথক স্বতন্ত্র বিষয়। একটি দিয়ে অন্যটিকে বিচার করা যায় না। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বোয়াই-এর ভাষায় ব্যবসা ও নৈতিকতা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। অন্যভাবে বলা যায়-

"Business ethics is an oxymoron, a contradiction in terms, like, 'jumbo shrimp'. If you want to be ethical; join a monastery or be a teacher, but if you want get into business, recognize it's a tough, dog-eat-dog competitive world where ther's no room for softies or bleeding hearts." (Duska, 1960: 17-18)

দ্বিতীয়তঃ ব্যবসার সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্ক প্রসঙ্গে দ্বিতীয় ধারাটি অনুসারে মনে করা হয়-

"The sole purpose of business is to make a profit but it justifies business's single-minded pursuit of profit on moral grounds." (Bowie & Duska, 1960:18)

দ্বিতীয় ধারাটিতে ব্যবসার নৈতিকতার সম্ভাবনা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

উপযোগবাদীগণ দাবী করেন, মুনাফা লাভের প্রত্যাশা থেকে যদি ব্যবসাকে নৈতিকভাবে বিচ্যুত না করা হয় তা হলে সমাজ লাভবান হবে। একইভাবে ব্যবসায়ী জনগণ যদি তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে এবং ব্যবসার প্রয়োজনে নৈতিক বাধ্যবাধকতার বিষয়টি বিবেচনা করেন তাহলে, সেই বাধ্যবাধকতা নৈতিকভাবে সমাজকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে। একজন সৎ, কল্যাণ প্রত্যাশী ব্যবসায়ীর দৃষ্টিভঙ্গি যতোটাই কঠোর হোক না কেন, কিংবা ব্যবসায়ী হিসেবে ঐ ব্যক্তির অন্যান্য সামাজিক ভূমিকার (বন্ধু, আত্মীয়, ভাই, ইত্যাদি) সঙ্গে যতোই বিরোধ সৃষ্টি করা হোক না কেন, সঠিক ব্যবসায়িক অনুশীলনই হল একজন ব্যবসায়িকের জন্য নৈতিক কাজ। Bowie & Duska'র ভাষায়- "Since good business is good ethics, good ethics will be good business too" (Bowie & Duska, 1960:18) এজন্য কোন বন্ধু যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন ক্ষতিকর হন তাহলে তাকে অব্যাহতি দেওয়াই নৈতিক হবে। অন্যথায় ঐ ব্যক্তি দ্বারা ক্ষতির অবস্থাটি প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্ত অধিক সংখ্যক কর্মচারীকে বহন করতে হবে।

তৃতীয়তঃ তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মনে করা হয় 'Profitable business' অন্যের ক্ষতির কারণ হতে পারে সকল সময় তা অনৈতিক হবে। এধরনের 'Profitable business intention' নীতি অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহী করে থাকে। ফলে, ভোক্তার চাহিদা অল্প আয়েশে পূর্ণ হয়ে থাকে। 'ব্যবসা' দ্বারা সেবার মাধ্যমে মূলত সামাজিক উন্নয়নের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা হয়। এর ভিত্তিতে Bowie & Duska বলেন, "This view seems to be the most commonly accepted one of the ethics of business today" (Bowie & Duska, 1960:18)।

ব্যবসা ও নীতিবিদ্যার সঙ্গে সংশিষ্টতার প্রসঙ্গটি আরো স্পষ্ট করার জন্য নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে : ব্যক্তিগত ক্রিয়া (Individual action), সামাজিক মূল্যায়ন (Social practice), এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Social institution), । ব্যক্তিগত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা যায়-দ্রব্য/পণ্যটি বিক্রি করার জন্য রহিমের কি মিথ্যা বলা উচিত? আবার সামাজিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা যায়- 'সাধারণভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মিথ্যা বলা কি ব্যবসায়িক প্রথা (Business practice) ?' তৃতীয় অবস্থার ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা যায় 'কোন কর্পোরেশন এবং ফার্ম যদি ব্যবসা প্রক্রিয়া বা লাভজনক রীতিকে অনুসরণ করে, তাহলে সেটি কি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ভরযোগ্য কোন নৈতিক পন্থা হিসেবে বিবেচিত হবে?' তৃতীয় প্রশ্ন সাপেক্ষে বলা যায়, ব্যবসা হল এক ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ঐতিহাসিকভাবে দেখা গিয়েছে মানুষ তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে ব্যবসায় প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন।

উপর্যুক্ত তিনটি বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রেখে ব্যবসা পদ্ধতি প্রসঙ্গে বোয়াই এবং ডুসকা আরো তিনটি পশ্ন উত্থাপন করেন।

১. "ব্যবসা পদ্ধতি সাধারণভাবে যাকে আমরা 'capitalist system' বলি তা কি নৈতিকভাবে আত্মরক্ষামূলক কোন পদ্ধতি?" যদি তাই হয় তবে আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়, ২. যেমন, ক্রয় বিক্রয়, বন্টন, হিসাব-সংরক্ষণ, চুক্তি, বিজ্ঞাপন, প্রচার, চাকুরী প্রদান ইত্যাদি অনুশীলন কি নৈতিকভাবে আত্মরক্ষামূলক? এবং ৩. এসব অবস্থা যদি কোন নির্দিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহলে বিশেষ কোন উৎপাদিত পণ্য-সামগ্রী বিক্রি করা বা নিয়ন্ত্রণ করার পিছনে কি কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড , নিয়ম কাজ করে বলা যায়? যদি থাকে তবে সেগুলো কি সঠিক? এ সকল প্রশ্নের বৈধ জবাবের পরিপ্রেক্ষিত বিচার লাভ সাপেক্ষেই কিন্তু নৈতিকতার

প্রশ্নটি চলে আসে। সুতরাং ব্যবসার ক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রসঙ্গটি খুবই সংগত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়।

দুই

ব্যবসায় নৈতিকতার মূল প্রতিপাদ্য আরো স্পষ্ট করার জন্য ব্যবসায় অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন এবং এদের সঙ্গে নৈতিক সম্পর্কের স্বরূপ পর্যালোচনা অত্যাবশ্যক। সেগুলো হলো-

বাজারজাতকরণ (Marketing) নৈতিকতা ঃ

ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ পলিসি হলো বাজারজাতকরণ। বাজারজাতকরণের ধারণা সম্পর্কে ফিলিপ একটি চিত্র প্রদান করেন। তা হলো-

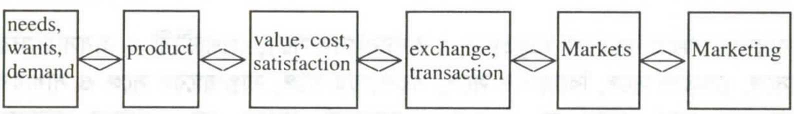

(The concept of marketing)

(Source: Phillip, 1991:4)

বাজারজাতকরণের সময় দ্রব্যের চাহিদা ও প্রয়োজনানুসারে ঐ দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। সেই দ্রব্যের চাহিদা ও তৃপ্তি অনুসারে মুল্য নির্ধারণ করে ক্রেতা ও বিক্রেতা তা বিনিময় করেন। এখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যে সম্পর্ক তা নৈতিক। কারণ ক্রেতা তার চাহিদা, তৃপ্তি ও প্রয়োজনানুসারে ঐ দ্রব্যের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করে এবং বিক্রেতা উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করে তা থেকে মুনাফা অর্জন করে থাকেন যা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে উত্তম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে থাকে। এখানে বিক্রেতা জোরপূর্বক ঐ দ্রব্য ক্রেতার উপর আরোপ করছেন এরকম বলা যাবে না। আবার ক্রেতা তার চাহিদা ও ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই তা ক্রয় করছে। সুতরাং ক্রেতার তৃপ্তি অনুসারেই তা বিক্রয় করা হচ্ছে।

ব্যবসার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উদ্দেশ্য হল কল্যাণ সাধন করা। ব্যবসা যদি কল্যাণের পথে পরিচালিত হয় তবে তা নৈতিক হবে। বেঁচে থাকার জন্য টাকা ও অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। কাজেই বেঁচে থাকার তাগিদে যদি অপরের কল্যাণ সাধন করে ব্যবসা পরিচালিত হয়, তাহলে তা নৈতিক। কিন্তু আধুনিককালের ব্যবসা কল্যাণের

জন্য ব্যবসা নয়, আমরা মূলত দেখি অর্থ উপার্জনের জন্যেই ব্যবসাকে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। ব্যবসা যখন অর্থের জন্য অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে পরিচালিত হয়, তখন তা আর নৈতিক থাকে না। কিন্তু বেনথামের উপযোগবাদ অনুসারে, এই অর্থই যদি প্রত্যেক ব্যবসায়ীর সুখ উৎপাদনে সক্ষম হয়, তা হলে সকল ব্যবসায়ীদের সুখ একত্রিত করে সর্বোচ্চ পরিমাণের সুখ পাওয়া যাবে। আবার এ সুখ যদি সমাজের সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সুখ নিশ্চিত করে তবেই কা নৈতিক হবে। কিন্তু এটি যদি সর্বাধিক লোকের সুখ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয় তবে তা অনৈতিক হবে। আমাদের দেশে অর্থের জন্য অর্থের উপার্জন মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোক সুখ ভোগ এবং অন্যান্যদের দুঃখ বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে থাকে অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষকে সুখভোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়- সেজন্য তা অনৈতিক। সুতরাং ব্যবসাকে যদি অর্থের জন্য অর্থ উপার্জন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয় তাহলে সেটি অনৈতিক হবে।

ব্যবসার ক্ষেত্রে কমবেশী মজুতদার ও অন্যান্যদের সঙ্গে, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে, ক্রেতার সঙ্গে, বিক্রেতার সঙ্গে, সরকারের সঙ্গে, সাপ্লায়ারের সঙ্গে ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোন না কোনভাবে সুসম্পর্ক রাখতে হয়। এছাড়া ব্যবসায় প্রতিযোগিতা, উৎপাদনের কাঁচামাল, পণ্যদ্রব্য বাজারজাতকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভূমিকার মোকাবেলা করতে হয়। এ সকল ক্ষেত্রে কিছু কিছু আইন থাকলেও তা কিন্তু সব সময় প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। এরকম পরিস্থিতিতেই আমাদের নৈতিকতার অনুশীলন করা উচিৎ। ব্যবসা ক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রধান ক্ষেত্র হলো মুনাফা অর্জন করা অপেক্ষা সঠিক ও ভালভাবে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো। ব্যবসায় নৈতিকতা প্রসঙ্গে স্প্রাইজেল বলেন,

"Ethics of business tend to encompass Philosophical rather than legal views and moral rather than theological concepts" (Spriegel, 1962:497)

প্রতিযোগিতা ও নৈতিকতা

বাজারে একই পণ্যের বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন ব্রান্ড বা প্রতিযোগিতামূলক পণ্যসমাগ্রী রয়েছে। এদের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে প্রতিযোগিতা হতে পারে। যেমন, ছোট কোম্পানীর সঙ্গে বড় কোম্পানীর, ছোট ব্যবসায়ীর সঙ্গে বড় ব্যবসায়ীর, সমান সমান অর্থ শক্তির মধ্যে, এবং দ্রব্যের মানগত দিকের সঙ্গে। এসকল ক্ষেত্রে নৈতিক আচরণ আবশ্যক। সকল বিষয়ে ক্রেতার চাহিদা ও তৃপ্তির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে

হবে, দ্রব্যের মূল্য যেন ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতার নাগালে থাকে এ বিষয়ে বিক্রেতা বা কোম্পানীর কোনরূপ হস্তক্ষেপ বা দ্রব্যের উপর কোনরূপ জোরদারী প্রয়োগ না করেই প্রতিযোগিতার বাজারে উন্মুক্ত করা প্রয়োজন, কারণ ভোক্তার ইচ্ছা স্বাধীন ও শর্তহীন। সুতরাং প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে নৈতিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে নৈতিকতা

দ্রব্যের দর কষাকষির মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণের বিষয়টিও নৈতিকভাবে বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। নৈতিকতার সঙ্গে যদি কোন দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয় তাহলে অবশ্যই হবে ক্রেতা বিক্রেতার চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় বিক্রয় করার মনোভাব ও তৃপ্তির উপর ভিত্তি করে। এ সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে যদি দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয় তাহলে নৈতিকতার আলোকে মূল্য নির্ধারণ হয়েছে বলা যাবে।

বিক্রয়ে নৈতিকতা

বিক্রেয়ের ক্ষেত্রে নৈতিকতার অনুশীলন ব্যবসায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে। অনেক সময় কোন দ্রব্য বিক্রয়ের সময় বিক্রেতা ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিভিন্ন আকর্ষণীয় বিষয় উপস্থাপনা করেন এবং ক্রেতার সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য দ্রব্যের গুণাগুণকে প্রকাশ না করে দ্রব্য সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রদান করে থাকেন। ক্রেতা এরকম মিথ্যা তথ্য দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হন, কার্যত দ্রব্য থেকে যে পরিমাণ তৃপ্তি আশা করেন তা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন। এরকম ভুল তথ্য ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্ককে ভিন্ন দিকে প্রভাবিত করে থাকে- যা নৈতিকতার মানদন্ডে অনৈতিক। এজন্য দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার আচরণ ও মনোভাব এমন হতে হবে যেন বিক্রেতা ঐ দ্রব্যের গুণাগুণ সম্পর্কে ক্রেতার নিকট সার্বিক তথ্য প্রদান করেন এবং দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করার সময় দ্রব্যের চাহিদা ও তৃপ্তির বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করেন। তবেই বিক্রেতার বিক্রয়ের বিষয়টি নৈতিকতার আলোকে গৃহীত হয়েছে বলা যাবে।

ক্রয়ের ক্ষেত্রে নৈতিকতা

ক্রয়ের ক্ষেত্রেও নৈতিক হতে হবে। কোন ক্রেতার বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয়ের চাহিদা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে যদি ক্রেতা তার চাহিদা, আকাঙ্খা ও প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে কোন দ্রব্য ক্রয়ের মনোভাব প্রকাশ করেন তবে তাই নৈতিক হবে। এজন্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার আচরণ নৈতিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমদানি ও নৈতিকতা

মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাজারের দিকে লক্ষ্য করলে দেখব যে, এমন কিছু পণ্য বা দ্রব্য রয়েছে যা আমাদের দেশে উৎপাদন খরচ বেশি বিধায় তার মূল্যও নির্ধারিত হয় সেই অনুপাতে। আবার অন্য দেশ থেকে তা আমদানি করলে তার মূল্য আমাদের দেশের উৎপাদিত দ্রব্য অপেক্ষা অনেক কম হবে। এখন প্রশ্ন হল পণ্যসামগ্রীর বিক্রয়মূল্যের দিকটি বিবেচনায় রেখে তা আমদানি করা কি নৈতিক হবে? আমাদের দেশের উৎপাদিত দ্রব্যের পরিবর্তে ভিন্ন দেশ থেকে তা আমদানি করার বিষয়টি নৈতিক প্রশ্নের মুখোমুখি থেকে যায়। কারণ এতে করে আমাদের দেশের শিল্প শ্রমিকরা তাদের শ্রমের মর্যাদা হারাবে এবং একটি পর্যায়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ অচল হয়ে পড়বে ফলে শ্রমিকের জীবনে নেমে আসবে অশান্তি। বিষয়টিকে যদি মিল ও বেন্থামের উপযোগবাদ অনুসারে বিচার করা হয় তাহলে তাকে নৈতিক হিসেবে প্রতীয়মান করা যেতে পারে। কারণ এক্ষেত্রে আমদানিকৃত দ্রব্য অতি অল্প মূল্যে ক্রয় বিক্রয় করা যাবে, অনেক সময় এর গুণগত মান আমাদের দেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হবে। আমদানিকৃত দ্রব্যটি বিক্রয়মূল্য, গুণগতমান ইত্যাদি সকল দিক থেকে আমাদেরকে সর্বোচ্চ তৃপ্তি প্রদান করছে বলা যায়। দ্রব্য যদি ক্রেতার তৃপ্তিকে তুষ্ট করে তবে তা নৈতিক হবে। সুতরাং তৃপ্তির সর্বোচ্চকরণের দিক থেকে পণ্য আমদানি করা নৈতিক ধরা যেতে পারে। কিন্তু পণ্যসামগ্রির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে গড়ে উঠা শ্রমজীবী মানুষের জীবনের মূল্য, স্বজাত্যবোধ ইত্যাদিকেও বিবেচনায় রাখা বাঞ্ছনীয়।

ব্যবসায় সেবা ও নৈতিকতা

ব্যবসায় প্রধান তিনটি গোষ্ঠী (Three groups) রয়েছে- ক. বাণিজ্য (Commerce) খ. শিল্প কারখানা (Industry) এবং গ. সেবা (Service) মূলক প্রতিষ্ঠান। বাণিজ্যগোষ্ঠী (Commerce groups) হলো কোন দ্রব্য স্থানান্তর, সংরক্ষণ, "Gruding, ware housing, innering" এবং "Financing in connection with the transfer of goods" বুঝায়। শিল্প-কারখানাকে (Industry) আবার "genetic, extractive, manufacturing" এবং 'construction' কে বুঝায়। সেবামূলক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মূলতঃ ডাক্তার, শিক্ষক, সরকার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয়ে থাকে। ডাক্তার, শিক্ষক বা সরকারি পেশাদার কোন ব্যক্তি যখন অর্থের বিনিময়ে সেবা প্রদান করেন তখন তা অনৈতিক হয়ে থাকে, কারণ এখানে সেবার ধারণাটি মুনাফা অর্জনের তাগিদ থেকে

এসে থাকে। কিন্তু ডাক্তার ও শিক্ষক যখন আন্তরিকতার সহিত তাদের পেশাকে সেবার কর্ম হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তার পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু অর্থ উপার্জন করেন তা হলে তা নৈতিক হবে। ব্যবসায় নৈতিকতার প্রসঙ্গটিকে শিল্প ক্ষেত্রের একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে পারি- যেমন, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি মেয়াদকালনি সময়ে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তা হলে ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডসমূহ প্রায়ক্ষেত্রেই নিয়ম-নীতি বহির্ভূত হয়ে থাকে। কারণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার না থাকার কারণে পণ্যের গুণগতমানও সেই অর্থে বজায় রাখার চেষ্টা করে থাকে। ফলে ঐ প্রতিষ্ঠান মনোপলি ব্যবসায়িক সুবিধা অর্জন করে থাকে, যা ক্রেতার স্বার্থকে হেয় প্রতিপন্ন করে থাকে। এরকম মনোপলি ব্যবসা ভোক্তাকে সেবা প্রদান তো করেই না বরং বঞ্চিত করে থাকে- যা নীতিগতভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং ব্যবসার ক্ষেত্রে সেবা একটি নৈতিক প্রত্যয়।

ব্যবসায় ধাপ্পাবাজি ও নৈতিকতা

ব্যবসায় মুনাফা লাভের প্রশ্নে ব্যবসায়ীগণ বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। ক্রেতাকে প্ররোচিত করার জন্য দ্রব্যের গুণগত মান প্রসঙ্গে ধাপ্পাবাজি করা হয়, কিংবা উৎপাদিত দ্রব্যটি অপেক্ষাকৃত অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় কিভাবে বহুল বাজারজাতকরণ করা যায়- সেই লক্ষ্যে উৎপাদনকারী ধাপ্পাবাজির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে ধাপ্পাবাজি কি নৈতিকভাবে সিদ্ধ? আলবার্ট কার 'Is Busniess Bluffing Ethical?' (February, 1968) প্রবন্ধে একটি সমাধান দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, ব্যবসার ক্ষেত্রে কতগুলো নিয়মন-কানুন অনুসরণ করতে হবে। এই নিয়ম কানুনগুলো হলো ব্যবসার জন্য এক বিশেষ প্রকারের নৈতিকতা। কিন্তু একথা সত্য যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যেকটি কাজ নীতি-নৈতিকতা অনুসরণ করে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। আলবার্ট কার মনে করেন, ব্যবসা হল এক ধরনের 'Competitive' enterprise', একে তিনি 'poker game' বলেও উল্লেখ করেন। কেননা 'poker game' এক ধরনের উদ্দেশ্য এটিকে জয়লাভ করার নিমিত্তেই আমরা অংশগ্রহণ করে থাকি। একজন ব্যক্তি প্রাথমিক নৈতিক নিয়ম হিসেবে 'Do unto others as you would have them to unto you' নীতিটিকে ব্যবসার ক্ষেত্রে মেনে নিতে পারেন, আবার 'Competitive game to business' এর ক্ষেত্রে উপরোক্ত নৈতিক নিয়মটিই পরিবর্তিত করে বলা যেতে পারে "Do unto other what you would not have them do to you, before they do it to you", এ প্রসঙ্গে আলবার্ট কার বলেন, জুয়া খেলার জন্য প্রযোজ্য নিয়মগুলো কখনোই সভ্য মানুষের পারস্পরিক

সম্পর্কায়নের জন্য নৈতিক আদর্শ হতে পারে না। কেননা জুয়ারী সকল সময় জুয়ার জয়লাভের জন্য ধাপ্পাবাজি করবে বন্ধুহীনতা, হৃদয়হীনতা, ধাপ্পাবাজি, ধুরুন্দরপনার পরিচয় দিবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে অনুরূপ নীতি প্রয়োগ করা যায় না। আলবার্ট কারের ভাষায়-

"Poker's own brand ethics is different from the ethical ideals of civilized human relationships. The game calls for distrust of the other fellow. It ignores the claim of friendship. Cunning deception and concealment of ones strength and intention, not kindness and open heartedness, are vital in poker. No one thinks any worse of poker on that account. The game of business because its standards of right and wrong differ from the prevailing tradition of morality in our society." (Carr, Albert, 1968: 145)

আলবার্ট কার আরো বলেন, একজন ব্যবসায়ীকে সামাজিক মানুষ হিসেবে কতগুলো নৈতিক মানদণ্ড অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু তিনি যখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক বা পরিচালকের ভূমিকায় আসেন তখন সামাজিক জীবনের নিয়ম-কানুনগুলো খুইয়ে দিতে হয়। যেমন, বাইবেলের সুবর্ণ নিয়মটি (Golden rule) সমাজের জন্য আদর্শ হতে পারে। কিন্তু ব্যবসার জন্য নিয়মটি কার্যকরী মডেল নাও হতে পারে। আলবার্ট কার বিষয়টি প্রসঙ্গে বলেন-

"That most business are not indifferent to ethics in their private lives, everyone will agree. My point is that in their office lives they cease to be private citizens; they become game players who must be guided by some what different set of standards. The golden rule, for its value as an ideal for society, is simply not feasible as guide for business. A good part of the time for businessman is trying to do unto others as he hopes others will not do unto him." (Carr, Albert, 1968: 145-146)

বিশেষ কতকগুলো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলবার্ট কারের বক্তব্যকে সঠিক বলা যায়। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে গৃহীত পলিসি বেশির ভাগ অবস্থায় জুয়া খেলার মতো। ব্যবসায়িক জীবনে কতগুলো গ্রহণযোগ্য নিয়ম আছে- যার সাহায্যে মুনাফা লাভ হয়। আবার কতগুলো নিয়ম আছে যেগুলো কার্যকরী এবং নিষ্ক্রিয়। কিন্তু তারপরও

ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা, ধাপ্পাবাজি এবং আতিশয্য রয়েছে- এর ভেতর দিয়ে সেসব নিয়মসমূহের অনুশীলনকে তিনি ব্যবসায় নীতিবিদ্যা বলতে চাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে তার অন্য একটি ভাষ্য উল্লেখ করা যেতে পারে।

"Business is our main area of competition, and it has been ritualized into a game of strategy. The basic rules of the game have been set by the government, which attempts to detect and punish business frauds. But as long as a company does not transgress the rules of the game set by the law, it has the legal right to shape its strategy without reference to anything but its profits. if it takes a long term view of its profits. It will preserve amicable relation, so far as possible with those with whom it deals. But decisions in this area, in the final test, decisions of strategy, not ethics.... (Thus) If a man plans to take a seat in the business game owes it to himself to master the principles by which the game is played, including its special ethical out look." (Carr, Albert, 1968: 148)

ব্যবসায়ে নৈতিকতা প্রসঙ্গে আলবার্ট কারের অভিমত হলো- নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদের (ethical relativism) সমপর্যায়ভুক্ত। নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদের মূল প্রতিপাদ্য হল- (১) প্রত্যেকটি সামাজিক গোষ্ঠীর নিজস্ব কিছু নৈতিক বিশ্বাস রয়েছে, (২) এই বিশ্বাসসমূহ ঐ জনগোষ্ঠীর জন্য যথার্থ বা সঠিক হবে। সংক্ষেপে, নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ প্রসঙ্গে বলা যায়- নৃতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ রয়েছে। এই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত হয় ঐ জনগোষ্ঠীর নৈতিকতা; যেমন, ফিজি দ্বীপের জনগোষ্ঠীর নৈতিক বিশ্বাসকে কখনো মুসলিম ধর্মবিশ্বাসী মানুষের নৈতিক বিশ্বাস হিসেবে আরোপ করা যাবে না। আবার ধূর্ত ঠকবাজ মানুষের ধূর্তামীকে জনসমষ্টির জন্য প্রচলিত নৈতিক বিশ্বাস বলা যাবে না। আলবার্ট কারের ভাষ্যানুযায়ী, ব্যবসায় নৈতিকতার নিয়মটি আপেক্ষিকতা দোষে দুষ্ট হবার ফলে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। যদি আলবার্ট কার সুবর্ণ নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বলেন- 'Do unto as do others'- তখন নিয়মটিকে 'পরহিতবাদ' হিসেবে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য ধরা যেতে পারে।

আলবার্ট কার ব্যবসায়ে নৈতিকতার বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একে 'Poker games rule' এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। সাদৃশ্যানুমানটি একটি দিক থেকে যথার্থ, কেননা জুয়া খেলায় একজন বন্ধুও বিরুদ্ধে-মনোভাব দেখাতে পারেন। তার অর্থ এই নয় যে, বন্ধুকে খেলায় পরাজিত করার মানসিকতাটি সকল সময় লালন করতে হবে। ব্যবসা নৈতিকতা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে কার মূলত একথাই বলতে চান যে, ব্যবসায়িক সম্পর্কটা (business relation) অনেকটা এরূপই হয়ে থাকে। কিন্তু নৈতিক বিচারে আলবার্ট কারের এ অভিমত যৌক্তিকতার দাবী হারিয়ে ফেলে। ব্যবসায়ে নৈতিকতার পর্যালোচনায় ফ্রেডম্যানের চিরায়ত তত্ত্বটি প্রণিধানযোগ্য। তাঁর বক্তব্য হল-

"There is one and only social responsibility of business- to use its resources and engage in activities designed to increase its profits as long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competiton without deception and fraud." (Friedman, Milton, 1970:126)

কোন প্রকার প্রত্যাশা এবং ঠকবাজীর আশ্রয় না নিয়ে মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ব্যবসায় লাভ করা মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ ব্যবসার মূল লক্ষ্যই হল মুনাফা লাভের নিমিত্তে নিয়োজিত থাকা। ফ্রেডম্যান (Bowie & Duska, 1960: 1960) এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, মুক্ত বাজার ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানায় নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন, একজন কর্মচারী। তার দায়িত্ব হলো সরাসরি নিয়োগ কর্তাকে মেনে চলা। এই দায়িত্বের পাশাপাশি সামাজিক নিয়ম রীতি, আইন এবং নৈতিক সদাচরণ অনুসরণ করে তা প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

শ্রমিকের অধিকার এবং নৈতিকতাঃ

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইন্ডাষ্ট্রি, শ্রমিক প্রত্যেকেরই চাকুরীর নিয়ম কানুন মোতাবেক নিয়োগকর্তার কিছু শর্ত বা বিধি বিধান মেনে চলতে হয়। একজন কর্মঠ ও পরিশ্রমী নিয়োগকর্মী (employee) প্রথমত একজন মানুষ এবং তার সকল প্রচেষ্টা ও কার্যের মধ্যে কোনটি সঠিক হিসেবে গ্রহণ করা উচিত আবার কোনটি বেঠিক হিসেবে পরিত্যাগ করা উচিত তা বুঝতে পারার সামর্থ্য বা বাধ্যবাধকতাও তার রয়েছে। সকল কর্মকান্ড নৈতিকভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্ব তার নিজের উপরই রয়েছে। সুতরাং কোন কর্পোরেশন বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের উচিত ঐসব কর্মচারীদের যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা।

আমরা জানি যে, একজন মানুষের বিভিন্ন ধরনের অধিকার রয়েছে যেমন, নাগরিক অধিকার (civil right), মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার (right to freedom of speech) এবং নৈতিক অধিকার (moral right)। অধিকারের ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গভেদে সবাই সমান। তন্মধ্যে নৈতিক নিয়মানুসারে জীবনাচরণ করাও একধরনের নাগরিক অধিকার, যদিও সকল নৈতিক অধিকারসমূহ আইন আকারে লেখা থাকে না কিংবা রাষ্ট্রও এই আইনের প্ররোচিত উৎস নয়। তবুও নৈতিক অধিকার সবারই রয়েছে, বোয়াই এবং ডুস্‌কার ভাষায় নৈতিক অধিকার হল-

> " People have such right simply by virtue of being moral agents and worths of respects. The rights to life, liberty, and pursuit of happiness are among these moral rights." (Bowie & Duska, 1960: 149)

কেবলমাত্র যে সকল দাবী নৈতিকভাবে বিচার্য সেসব ক্ষেত্রে নৈতিক অধিকারের প্রসঙ্গে থাকে। কিন্তু সকল দাবীসমূহ নৈতিকভাবে বিচার্য হবে এমন কথা নয়। কিছু কিছু অধিকার রয়েছে যা আমাদের কর্মের স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। অন্যান্যরা আমাদের কর্মে হস্তক্ষেপ করবে না এটাই স্বাভাবিক, কিংবা জীবনের প্রতি আমাদের যে অধিকারবোধ তার কারণেই আমরা অন্যকে হত্যা করব না। কিংবা আমরা কেউ যদি উপবাসে থাকি তাহলে যাদের পর্যাপ্ত খাদ্য আছে, তারা খাদ্য সরবরাহ করবেন। ঠিক এই নৈতিক বিবেচনাই একজন ব্যবসা-নির্বাহী তার কর্মচারীদের মৌলিক অধিকারসমূহ বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবেন। কর্মচারীদের খাবার সুবিধার্থে বিভিন্ন রেষ্টুরেন্ট কিংবা সাবসিডি প্রদানসহ লাঞ্চ খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করবেন এটাই সঙ্গত। শ্রমিক বা কর্মচারীর যে সব অধিকার রয়েছে তাই হলো তার নৈতিক অধিকার। একজন শ্রমিক বা কর্মজীবী শুধু কর্মসাধন কিংবা পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হবেন না।

কর্মচারীর বাধ্যবাধকতাঃ

প্রত্যেকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বা কোম্পানীর কর্মচারী বা শ্রমিকের কিছু নৈতিক নিয়ম (moral law) মেনে চলবার বাধ্যবাধকতা থাকে। তাদের অবশ্যই কর্মক্ষেত্রে এমনকি অন্যান্য সময়ও সিভিল আইন মেনে চলবার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যেমন,

১. কর্মচারী কখনো প্রতিষ্ঠান থেকে চুরি করতে পারবে না। সেটা হোক একেবারে ক্ষুদ্র বস্তু যেমন স্ট্যাম্প, পেন্সিল, পেপার কিংবা অন্যান্য বস্তু। যদি তারা এসব দ্রব্য বা বস্তু মূল্য পরিশোধ করেও নিতে চায় তবু সেটা দর কষাকষির মাধ্যমে হতে হবে।

২. তারা অবশ্যই মিথ্যা কথা থেকে বিরত থাকবেন। মিথ্যা তথ্য প্রচার থেকে নিজেকে সংযত রাখবেন।

৩. তারা অবশ্যই চুক্তি মোতাবেক প্রতিষ্ঠানে কাজ করবে, এটা হল 'obligation of justice'।

ব্যবসা ও নৈতিক কোড

শিল্পক্ষেত্রে কিংবা ব্যবসা ক্ষেত্রে নৈতিক নিয়মসমূহের উন্নয়ন সাধন করার একটি মাত্র উপায় হলো নৈতিক কোডের (ethical code) উন্নয়ন সাধন করা। নৈতিক কোড হলো এমন কতগুলো নিয়মের সেট বা সমাবেশ যা বিশেষ কতগুলো ইন্ডাস্ট্রি এবং পেশায় অনুসরণ করা যায়। একথাও সত্য যে ব্যক্তির নিজস্ব নৈতিক অবস্থা কিংবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নৈতিক নিয়মগুলো অনুসরণ করে চলার জন্য 'নৈতিক কোড' ততোটা পর্যাপ্ত নয়। তবুও এর কিছু সুবিধা রয়েছে। যেমন,

প্রথমতঃ ব্যবসা ক্ষেত্রে নৈতিক কোডের সুবিধা হল কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি নীতি ও নৈতিকতাকে লঙ্ঘন করে ব্যবসা কার্য চালাতে চান তা হলে চাপ প্রয়োগ করে তাকে নীতি নিয়ম মানতে বাধ্য করানো সম্ভব। বস্তুত নৈতিক কোড হল এমন যা আমাদের সিদ্ধান্ত তৈরির সময় "Set of behavioral expectation" হিসেবে কাজ করে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ নৈতিক কোডের দ্বিতীয় সুবিধা হল এটি মানব ব্যক্তিত্ব কিংবা ধারাবাহিকভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের কোনটি সঠিক বা বেঠিক, উচিত বা অনুচিত, তা স্থায়ীভাবে নির্ধারণ করে থাকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নৈতিকতার গুরুত্ব হল এর কারণে অনেক সময় কিংবা আবেগময় মুহূর্তেও জ্ঞানমূলক সিদ্ধান্ত নিতে পারি। কিন্তু নৈতিক ভাবে স্খলিত কোন ব্যক্তির ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তে নৈতিক কোড (ethical code) এক প্রকার আইনগত ঘটনা (matter of law or rules') হিসেবে কাজ করতে পারে।

তৃতীয়তঃ নৈতিকভাবে যখন আমরা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হই বা ব্যর্থতার স্বীকার হতে হয়, তখন নৈতিকতার কোডসমূহ আমাদের সাহায্য করে থাকে। যদি কোন ব্যবসায়িক নিয়ম বা চুক্তি নৈতিক কোডের অনুসারে করা হয় তাহলেই ঐ বিষয় সম্পর্কে নৈতিক আচরণের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

চতুর্থতঃ ব্যবসার ক্ষেত্রে কোডের প্রচলন তা শুধু কর্মচারীদের আচরণই নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলে না, বরং নিয়োগকর্মীগণ কিভাবে আচরণ করবেন তাও উল্লেখ করা থাকে। ব্যবসায়ী বা তার অধিভুক্ত কর্মচারী যদি অনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে তবে তা সুধরে দেবার ব্যবস্থা করে থাকে।

পঞ্চমতঃ পঞ্চম সুবিধা প্রসঙ্গে বোয়াই এবং ডুসকা বলেন,

"Code of ethics not only guide the behaviour of employees but they also control the autocratic power of employers." (Bowie & Duska, 1960:97)

এপ্রসঙ্গে তাঁরা অন্যত্র বলেন-

"Code of business ethics is clearly is that they could help specify the social responsibilities of business itself.... " (Bowie & Duska, 1960:98)

নৈতিক কোড প্রসঙ্গে তাঁদের সর্বশেষ ভাষ্য হল-

"The development of business code of ethics is clearly in the interest of business itself. There is virtual unanimity in the business community that unethical business practices threaten to bring about increased government regulation business." (Bowie & Duska, 1960:97)

ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রচলিত নৈতিক কোডের সুবিধার পাশাপাশি কিছু সমস্যাও রয়েছে। এ সকল কোডের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে তাঁরা বলেন-

"....these codes are often treated with great skepticism by many business people by representatives of the consuming public as well." (Bowie & Duska, 1960:98)

তিন

বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

উন্নয়নশীল বিশ্বে ব্যবাসয় মুনাফা লাভের বিষয়টি গুরুত্ব পাবার সঙ্গে সঙ্গে মানব কল্যাণের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে ব্যবসার ক্ষেত্রে নৈতিক কোড, ভোক্তাবাদ ব্যাপকভাবে আদৃত হচ্ছে। কিন্তু সেই তুলনায় বাংলাদেশে ব্যবসার জগতে বিরাজ করছে ব্যাপক নৈরাজ্য, ব্যহত হচ্ছে ভোক্তার অধিকার। ভোক্তার কল্যাণ বৃদ্ধি অপেক্ষা মুনাফা অর্জনকে অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। ক্রেতাদের কল্যাণ বৃদ্ধি অপেক্ষা ক্রেতা শোষণ করা হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যবসার প্রকৃত হালচাল। কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে "ভেজাল পণ্য, নকল পণ্য, প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন, দ্রব্যমূল্যের রাতারাতি ঊর্ধ্বগতি, পণ্যের গুণগত মানের প্রতি দৃষ্টিহীনতা, কালোবাজারী, মজুতদারী, বাতিলকৃত পণ্য বিক্রয় এসবকিছুই বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত। (ভট্টাচার্য, হরিপদ, ১৯৮৪: ৫০৯)। তাছাড়া প্রকৃত পণ্যের বদলে নকল পণ্য, নিম্নে বাংলাদেশের ব্যবসায় বিরাজমান অনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে কয়েকটি তালিকা প্রদান করা হলঃ

তালিকা-একঃ

নকল পণ্যেও প্রকার	প্রকৃত পণ্যের নাম	উৎপাদনকারীর নাম	নকল পণ্যের নাম	উৎপাদনকারীর নাম
সম্পূর্ণ নকল	১. মোরগ মার্কা নারিকেল তৈল ২. গন্ধরাজ কেশ তৈল ৩. নিভিয়া ক্রীম	সামস্য কেমিক্যাল ইন্ডাষ্টিজ, ঢাকা লালবাগ কেমিক্যাল ওয়ার্কস, ঢাকা টি.জি, স্মীর্থ এন্ড কোং, ইংল্যান্ড	মোরগ মার্কা নারিকেল তৈল গন্ধরাজ কেশ তৈল নিউ নিভিয়া ক্রীম	লালবাগ কেমিক্যাল ওয়ার্কসের নামে তৈরী ডেইজী কেমিক্যাল কোং, ঢাকা
প্রায় নকল	১. তিব্বত স্নো ২. ম্যানোলা ভ্যানিসিং ক্রীম	কোহিনুর কেমিক্যাল কোং, ঢাকা। পারফিউম কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রি লি, চট্রগ্রাম।	তিব্বত স্নো মনোলা ভ্যানিসিং ক্রীম	রোজিনা কেমিক্যাল কোং, ঢাকা। পারুল কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লি, ঢাকা।
আংশিক নকল	১. নিরালা ওয়াসিং সোপ ২. লাইফ বয় সোপ	লালবাগ কেমিক্যাল ওয়ার্কস, ঢাকা। লিভার ব্রাদার্স, চট্রগাম।	নিরালা ওয়াসিং সোপ লাইট বয় সোপ	রহমান সোপ ফ্যাক্টরী, ঢাকা। ইকবাল সোপ ফ্যাক্টরী, ঢাকা।

[Source: Department of Marketing, Dhaka University "Marketing observations" 1982:21]

বাংলাদেশের কয়েকটি ব্যবসায়িক খাতে অনৈতিক কর্মকান্ডের আরো একটি চিত্র নিম্নের চার্টে তুলে ধরা হলঃ

তালিকা-দুই

ব্যবসার খাত	
কসমেটিক্স	গুণগত মান- নিম্নমানের, অস্বাস্থ্যকর উপাদান-অপরিমিত,
গার্মেন্টস	স্থান-অস্বাস্থ্যকর, শ্রমনীতি-অনুসরণ করা হয় না।
ফার্মাসিউটিক্যালস	গুণগত মান-অনেকক্ষেত্রে প্রশ্নসাপেক্ষ, অস্বাস্থ্যকর, পরিবেশ নীতি মানা হয় না। ব্যবহারবিধি- মেয়াদোত্তীর্ণ, পরিমাপ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।
খাদ্যজাত দ্রব্য	প্রকৃতি-স্বাস্থপ্রদ পন্থার উৎপাদিত হচ্ছে না, বিধি- অনেক ক্ষেত্রেই বি.এস.টি.আই. অনুমোদিত নয়। হলেও বি.এস.টি.আই.এর যোগসাজশে কারচুপি করা হয়। বাজারজাত-মেয়াদোত্তীর্ণ হবার পরেও ৬০ ভাগ খাদ্য বাজারজাত হচ্ছে।
ব্যবহার্য সামগ্রী ১. বস্ত্র ২. জুতা ৩. তৈজষ পত্র	টেকসই-মূল্যের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ পণ্যমূল্য-পণ্যের তুলনায় মাত্রাতিরিক্ত
কেমিক্যাল- ১. কীটনাশক ২. জৈব সার	১. ইচ্ছেমত ব্যবহার করা হচ্ছে ২. পরিবেশ বিপর্যয় ঘটছে।
পরিবহণ ও নির্মাণ সামগ্রী	১. খুচরা যন্ত্রাংশ নকল ম্যানুফ্যাকচারিং ২. অতিরিক্ত মুনাফা

(সূত্রঃ তালিকা লেখকের নিজস্ব)

বাংলাদেশের ব্যবসার ক্ষেত্রে নৈতিক স্খলনের কথা উত্থাপিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। ক্রেতা-সাধারণের মধ্যে যদি গুণগতমান সম্পর্কে জরিপ করা হয় তাহলে এই স্খলনের বাস্তবতা আরো চাক্ষুষ হবে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে-

তালিকা-তিন

পণ্যদ্রব্য	**ব্রান্ড**	**নকল/ভেজাল স্থান**	**মন্তব্য**
কসমেটিক্স	ইয়ার্ডলি অব লন্ডল (পাউডার), (লোশন), জনসন কোং	জিঞ্জিরা	মাননিয়ন্ত্রিত নয়
মেডিসিন	ঢ, ণ, ত	সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ রোড, ঢাকা।	মেয়াদোত্তীর্ণ

(সূত্রঃ তালিকা লেখকের নিজস্ব)

ছক বিশ্লেষণঃ

উপরোক্ত ছকগুলো থেকে আমরা নিম্নোক্ত বিশ্লেষণ দাঁড় করাতে পারিঃ

প্রথমতঃ দেশী এবং বিদেশী অনেক গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য ভেজাল এবং নকল করা হচ্ছে। যেমন, অনেক বিদেশী কসমেটিক্স গুণগত ভাবে অত্যন্ত নির্ভরশীল এবং গ্রহণযোগ্য; যে কারণে এসব পণ্যের প্রতি ক্রেতাসাধারণের দৃষ্টি থাকে। সাম্প্রতিককালে ঢাকার জিঞ্জিরা (কেরাণীগঞ্জ থানা) এসব পণ্যের পরিত্যাক্ত বা ব্যবহৃত বোতল এবং কৌটাসমূহ কৌশলগত উপায়ে একেবারে নতুন করে, ভেজাল পণ্য, স্থানীয়ভাবে তৈরী নিম্নমানের পণ্য অনুপ্রবেশ করে বাজারজাত করছে। ভেজাল প্রস্তুতকারক ভোক্তাকে ঠকিয়ে মুনাফা অর্জন করছে। এই মুনাফা অর্জনের পেছনে দুটি অনৈতিক প্রভাব বিবেচ্য।

১. ব্যবসার একটি অন্যতম লক্ষ্য হল মুনাফা স্ফীত করা। এ হিসেবে জিঞ্জিরার ভেজাল পণ্যের প্রস্তুতকারক অনায়াসে, স্বল্প মূলধনে উন্নত পণ্যের লেবেলে নিম্নমানের পণ্য বাজারজাত করে প্রচুর মুনাফা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। সুতরাং স্থূল অর্থে ব্যবসা লক্ষ্য হিসেবে 'মুনাফা অর্জন নীতি' কে গ্রহণ করলে ভেজাল ও নকল পণ্যের বাজারজাতকরণ করাকেও ব্যবসার লক্ষ্য হিসেবে মেনে নিতে হবে। যা নৈতিকতার প্রসঙ্গটিকে বিভ্রান্ত করতে পারে।

২. কিন্তু আমরা যখন মুনাফা অর্জনের বিষয়টিকে নীতিগতভাবে বিচার বিশ্লেষণ করব তখন মুনাফা অর্জনের বিষয়টিকে স্থূল অর্থে গ্রহণ করা যায় না। কারণ উপরোক্ত দৃষ্টান্তে মুনাফা অর্জনের বিয়টি দুটি অবস্থার সঙ্গে জড়িতঃ ক. প্রতারণা, ও খ. হঠকারিতা। দুটি অবস্থাকে কখনোই নৈতিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা যায় না এজন্য মুনাফা অর্জনের বিষয়টি নীতিগতভাবে সমর্থিত হতে হবে। যা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায়ক্ষেত্রেই মেনে চলা হচ্ছে না।

দ্বিতীয়তঃ সাধারণত যেসব দ্রব্য রোগ নিরাময় ক্ষমতাসম্পন্ন এবং ঔষধের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেগুলোই ঔষধ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৌশলগত প্রগতির স্বাক্ষর রাখছে, ঔষধ বিজ্ঞানও সেই তুলনায় সমান্তরালে অগ্রসর হচ্ছে। এসব ঔষধের ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ রোগ-জীবাণুর

আক্রমণ প্রতিহত করে সুস্থ জীবনযাপন করতে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ঔষধ শিল্পের সঙ্গে সংশিষ্ট ব্যবসায় লক্ষ করা যাচ্ছে নৈরাজ্য, হঠকারিতা, প্রতারণা; যেমন,

ক) প্রায়ই দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায়-মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ ব্যবহার করার ঘটনা।

খ) ভেজাল ঔষধে বাজার সয়লাব হয়ে যাচ্ছে।

গ) ঔষধের মাত্রাগত পরিমাণে কারচুপি হচ্ছে।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জনের জন্য প্রস্তুতকারক এবং বিক্রেতা হঠকারিতা ও প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে। যা নিম্নের ছকের অনুরূপঃ

তালিকা-চার

মুনাফার ধরন

নং	প্রতারণার ধরন	প্রকৃতি	পরিমাণ	মুনাফা
১.	মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বাজারজাতকরণ	একটি ঔষধ যার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে ২০০০ সালের আগষ্ট মাসে, তাতে আবার ২০০১ এর আগষ্ট মাসের ছাপ দিয়ে বাজারজাত করা হচ্ছে।	অর্থমূল্যে ১০ কোটি টাকা, পরিত্যক্ত হলে মুনাফা শূণ্য	বাস্তবিক লাভ হচ্ছে (১০+১০) কোটি= ২০ কোটি টাকা।
২.	ভেজাল ঔষধ বাজারজাতকরণ	ফার্মাসিউটিক্যাল মান নিয়ন্ত্রণ না করে, রক্ষণাবেক্ষণে, গুদামজাতকরণে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় রক্ষণশীল না হয়ে ইচ্ছে ইচ্ছেমতো ঔষধ প্রস্তুত হচ্ছে- ফলে ঔষধের সিরাপে ছত্রাক, বিভিন্ন ট্যাবলেটে আবর্জনার অংশ পরিলক্ষিত হচ্ছে। যা সেবনে রোগীর আরোগ্য লাভ অপেক্ষা মৃত্যু অবধারিত হবে।	সস্তা শ্রমিক বিনিয়োগ, মুনাফার তালনায় অর্থ বিনিয়োগ পর্যাপ্ত নয়।	অপ্রত্যাশিত মুনাফা অর্জিত হচ্ছে।
৩.	পরিমাণে কারচুপি	কোন ঔষধ যেখানে ৫০০ মি.গ্রা. থাকার প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে অধিকাংশ ঔষধ কোম্পানীসমূহ মুনাফা লাভের আশায় পরিমাণ কম দিচ্ছে।	কাঙ্ক্ষিত ৫০০ মি. গ্রা. বাস্তবে ২৫০ মি. গ্রা.	২৫০ মি. গ্রা. ঔষধের উপাদান প্রতি ট্যাবলেটে লাভ হচ্ছে।

(তালিকা লেখকের নিজস্ব)

অথচ আমরা জানি ড্রাগ অ্যাক্ট এবং ফার্মাসিউটিক্যাল নীতিবিদ্যায় নিম্নোক্ত অবস্থাসমূহ অনৈতিকঃ

১. উপযুক্ত পরিবেশে ও নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত ঔষুধ তৈরী করা।

২. ঔষধ সংরক্ষণে যথোপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ না করা।

৩. ঔষধে উন্নত ও পরিমিত সক্রিয় উপাদান ব্যবহার না করা।

৪. চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত ও.টি.সি. ড্রাগ ব্যতীত অন্যান্য ড্রাগ বিতরণ করা।

৫. মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ, সন্দেহজনক ঔষধ বিক্রয় করা।

৬. বিশেষ ব্রান্ডের ঔষধ পক্ষপাতমূলকভাবে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন করে অতিরিক্তি মুনাফা অর্জন করা।

চার

উপসংহার

বিজ্ঞাপনের অগ্রগতি, মিডিয়ার উন্নয়ন এবং মানুষের চিন্তা ভাবনার নতুনত্ব সমকালীন বিশ্বের ব্যবসায়িক গতিপ্রকৃতিতে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করছে। বৈশ্বিকরণ নামে চলছে নুতন অর্থব্যবস্থা প্রচলনের তৎপরতা। মুক্তবাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্রেতা সাধারণের মধ্যে শ্রেণীগত বিভাজন সৃষ্টি করছে। বাজার উদারীকরণের নামে চলছে নীতি-নৈতিকতা বহির্ভূত অপতৎপরতা। এই প্রেক্ষাপটে ব্যবসা-বাণিজ্যে মানব কল্যাণের দিকটিকে তুচ্ছ করে মুনাফা অর্জনকে মুখ্য প্রতিপাদ্য হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। সভ্যতার এই মানব বিরোধী দৃষ্টির প্রতি আলোকপাত করে ই. এফ, শুমেকার বলেন-

"The economic calculus, as applied by present day economics, forces the industrialist to eliminate the human factor because machines do not make mistakes which do. Hence the enormous effort at automation and the drive for ever longer units. This means that those who have nothing to sell but their labour remain in the weakest possible bargaining position. The conventional wisdom of what is now taught as economics by

passes the poor, the very people for whom development is really needed."

(Schumacher. 1973:61)

মানুষের যেখানে উচিত জ্ঞানের পরিবৃদ্ধি দিয়ে মানব কল্যাণকে ত্বরান্বিত করা সেক্ষেত্রে জ্ঞানের শ্রবিৃদ্ধি তাকে কল্যাণের স্পর্শ দেয়া দূরের কথা মনুষ্যত্বকে নিম্নস্তরে ঠেলে দেয়ার জন্যেই জ্ঞানের ব্যবহার হচ্ছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষকে যেখানে উৎকৃষ্ট মানবিকতা দ্বারা আকৃষ্ট করার কথা, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানের মানবিকতাহীন যৌক্তিকতার চর্চা হচ্ছে বেশি করে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণার ফল এবং প্রযুক্তির ফলিত রূপ ইত্যাদি সভ্যতার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা অপেক্ষা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল মানবিক মূল্যবোধের স্রোতধারা থেকে। এই বিচ্ছিন্ন স্রোতধারার প্রতিক্রিয়ার পশ্চিম ইউরোপে সংঘটিত হয়েছিল শিল্প বিপ্লব; যা তৎকালীন বৃটিশ ও ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের কুফলগুলো উৎরিয়ে উঠতে সহায়তা করেছে (শরীফ, রায়হান, ১৯৮০: ৪০৩-৪০৪)। পাশাপাশি শোষণের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা নিপীড়িত মানুষকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু তার একশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় বাণিজ্যের কাঠামো শক্তিশালী হচ্ছে, ব্যবসা বাণিজ্যের সমর্থক ক্ষেত্রে আধুনিকায়ন হচ্ছে। আইন, বিধান, নৈতিক কোড প্রণীত হচ্ছে- তা সত্ত্বেও বাণিজ্যে চলছে ইম্পারফেক্ট কমপিটিশন- যা 'প্রডাকশন' ও 'ইমপোর্ট' দুই প্রক্রিয়াতেই একচেটিয়া নীতির আধিপত্য বৃদ্ধি পাচ্ছে (শরীফ, রায়হান, ১৯৮০: ৪০৭)। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই চিত্র আরো দূর্বিসহ ও ক্ষয়িষ্ণু। এখানে একচেটিয়াপনা, কৌশলনীতি ব্যবসাকে করে তুলছে শোষণের যন্ত্র হিসেবে। পণ্যের ষ্ট্যান্ডার্ড টেস্টের নামে চলছে চৌর্যবৃত্তি, উৎকোচ-আদান-প্রদান, ফলে অনেক মামুলি মানের পণ্য যা ব্যবহারে গণস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হতে পারে তাও বাজারজাত হচ্ছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ভোক্তার চাহিদা, তৃপ্তি ও প্রত্যাশা। ফুলে ফেঁপে বড় হচ্ছে এক শ্রেণীর মানুষ। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে। জীবন রক্ষাকারী ঔষুধের ক্ষেত্রেও স্ট্যান্ডার্ড টেস্টের তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। ব্যবসা বা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম ব্যবহৃত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এসব পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে সত্তুর দশকে ই. এফ. শুমেকার অর্থনীতি তথা ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় শুদ্ধতা ও নৈতিকতার উপলব্ধি করেছিলেন। এই উপলব্ধিই পারে ব্যবসায় বিদ্যমান সঙ্কট নিরসনে করতে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবসায় নৈতিকতার অনুশীলন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে; নিম্নোক্ত পদক্ষেপ আমাদের জন্য উপকারী হতে পারে ঃ

এক. ভোক্তাবাদ বা কনজুমারিজম কে সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে হবে যা বাংলাদেশের ক্রেতা এবং ভোক্তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে পারে।

দুই. রাসেল কার্সনের Silent Spring (১৯৫০) গ্রন্থে প্রস্তাবিত 'ভোক্তা অধিকার নীতি' অনুসরণ করে সফলতা পাওয়া যেতে পারে। সেগুলো হল-

ক) যে সমস্ত পণ্য ভোক্তার স্বাস্থ্য তথা জীবনের জন্য ঝুঁকি স্বরূপ তা এমনভাবে বাজারজাত করতে হবে যেন ভোক্তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়।

খ) পণ্যের বাজারজাতকরণের পূর্বে ভোক্তা এবং ক্রেতাকে অবহিত করতে হবে যাতে করে তারা প্রভাবিত না হয়। বিপণনকৃত পণ্যে, বিজ্ঞাপনে, লেবেলে এবং অন্যান্য কার্যকলাপে এমন কিছু থাকতে পারবে না যা প্রতারণামূলক।

গ) ক্রেতা এবং ভোক্তার পণ্য পছন্দ করার সুযোগ থাকবে। কোন বাজারজাতকারী তাকে পণ্য ক্রয়ে বাধ্য করতে পারবে না।

ঘ) পণ্যের ব্যাপারে ভোক্তার এবং ক্রেতার কি অভিমত অর্থাৎ কি মানের, কি মূল্যের, কেমন ধরনের বিজ্ঞাপন হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয়ে পণ্য বিপণনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মনযোগ সহকারে অনুসরণ করতে হবে।

তিন. প্রফেসর নার্কস তাঁর Problems of Capital Formation in Under Developed Countries' (1958) গ্রন্থে বলেন, অনুন্নত দেশের দারিদ্রের দুষ্ট চক্রের মূল কারণ হল অদক্ষ বিপণন ব্যবস্থা। এ অবস্থা উত্তরণের উপায় হল আদর্শ বিপণন ব্যবস্থার প্রচলন। আমরা নার্কসের সঙ্গে একমত হয়ে বলতে পারি আদর্শ বিপণন ব্যবস্থা ভোক্তার ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করতে পারে। আবার বিপণনে নৈতিকতার অনুশীলনই ভোক্তার ভোগ সর্বোচ্চকরণ ও জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। সুতরাং ব্যবসার ক্ষেত্রে নৈতিকতার অনুশীলন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে।

প্রচলিত মুক্তবাজার অর্থনীতির মুলনীতি 'আত্মস্বার্থ সর্বোচ্চকরণ' পন্থাকে পরিহার করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমরা সমকালীন অর্থনৈতিক দর্শনের পুরোধা অমর্ত্য সেনের 'On Ethics and Economics (1987) গ্রন্থে প্রণীত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করতে পারি। সেগুলো হলঃ

১. বাজার অর্থনীতির আত্মস্বার্থ চিন্তা ভিত্তিক প্রেষণার স্থলে অর্থনীতি বিশ্লেষণ কাঠামোকে র‍্যাশনাল করতে হবে। সেন প্যারোটা; বার্গস; স্কিটভোস্কী অনুসৃত সামাজিক কল্যাণের মানদণ্ড অনুসৃত হতে পারে।

২. ভোক্তার স্বত্তাধিকার (entitlement) বৃদ্ধি করতে হবে। কারণ বাজারে প্রচুর খাদ্যশস্য মজুদ থাকা সত্ত্বেও ক্রয়ক্ষমতার অভাবে পৃথিবীর কোথাও দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হচ্ছে। ভোক্তার ক্রয় করার অধিকার/ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে এই সঙ্কট দূর করা যেতে পারে।

৩. ব্যক্তি স্বার্থনীতি বা উপযোগিতার নীতি ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন, ওলিগোপলিষ্ট বাজার ব্যবস্থায় 'প্রিজনারস ডাইলিমা' দৃষ্টান্ত নিয়ে আমরা বলতে পারি উপযোগবাদী নীতির একরোখা অনুসরণ সমাজে অনভিপ্রেত ফলাফলের উদ্ভব করে। এজন্য বাজার ব্যবস্থায় উপযোগবাদী সিদ্ধান্তকে যদি সর্বশেষ অবস্থায় অনুসরণই করতে হয় তাহলে 'উপযোগিতার দ্বৈততাকে' মানতে হবে। সেনের ভাষায় দ্বৈততার একটি দিক হল- 'Individual as an agent', আরেকটি হল 'Individual in terms of his or her well being'। প্রথম অবস্থায় ব্যক্তি সংকীর্ণ বৈষয়িক লাভ-ক্ষতির প্রেষণা ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক, পারিবারিক বা দলীয় প্রেষণা, মূল্যবোধ ও আদর্শিক মূল্যবোধ দ্বারা তাড়িত হয়ে কাজ করে। ফলে ব্যক্তির 'যৌক্তিক আচরণ' আত্মস্বার্থকে অতিক্রম করে অন্য মানুষের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। এভাবে আমরা সংকীর্ণ উপযোগিতাবাদের আত্মস্বার্থনীতি পরিহার করে অর্থব্যবস্থাকে সর্বজনীন মানব কল্যাণের জন্য প্রণয়ন করতে পারি।

তথ্য নির্দেশিকা

1. ভূঁইয়া, আনোয়ারুল্লাহ, (জুন ২০০১) **'উপযোগবাদ বির্তক: সমকালীন নীতিদর্শনের আলোকে'**, কপুলা, XVII, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়,

2. Bowen,H.R (1994) ***Socia Responsibilities of the Businessman,*** Koontz. H., Management 10th edition, McGraw Hill.

3. Bowie and Duska (1960) **Business Ethics,** Pelicon, London.

4. Carr, Albert, (January/Feb1998) Harvard Business Review (July-August), Harvard,

5. Carr, Albert, (January/Feb 1968) **"In Business Bluffing Ethical?"** Harvard Business Review, vol.-46.

6. Churchman C. West, (1971) **The design of Inquiry Systems,** New Yourk, Basic Books.

7. Dale. E 91984) **'Corporate Social Responsibilities'** Harvard Business Review, January-February.

8. **Friedman, Milton, 1970 The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits,** New York, time Magazine.

9. Hargraxes and Danman. J (1975), **Business Survival and Change.** London, Associated Business Programs.

10. Hosmer, Larue, Tone, (1982) **Strategic Management: Test and Cases on Business Policy,** Englwod cliffs, N.J: Prentice Hall.

11. Hosmer, Larue Tone, (1990) **The Ethics of Management,** University Book Stall, New Delhi.

ISSN 1605-2021

LOK PROSHASON SAMOEEKY
Vol. 22,
March 2002/ Chaitra 1408

Human Development Index: A Study on Two Selected Villages of Bangladesh

S. M. Zobayer Enamul Karim*

Abstract: ***This article is an output of a study conducted on two villages in Bangladesh in respect of human development. In this study human development index (HDI) has been measured following the methods used in Human Development Report (HDR) of UNDP. Human Development Report focuses on the three essentials of human life- longevity, knowledge and decent living standards. Value of these three indicators have been calculated on the basis of the formula provided in Human Development Report. This article highlighted objectives & scope, conceptual terms, methodology, summarized version of findings & analysis etc. of the study done by the author himself. To augment the human development level of the people, a few recommendations have also been made in this paper.***

Introduction

There is a general consensus among all political economists and social scientists that economic growth and savings are not the only requisites to ensure the standard of living of the people. The pertinent issues in this respect are to develop the overall social structure of the society. In 1990 the time had come for a broad approach to improve human well-being that would cover all aspects of human life, for all people, in both high-income and developing countries, both now and in the future. It went far beyond narrowly defined economic development to cover the full flourishing of all human choices. It emphasized the need to put

* **Senior Research Officer, BPATC, Savar, Dhaka.**

people- their needs, their aspirations and their capabilities- at the center of the development effort.

In 1990, the first Human Development Report of UNDP, published under the inspiration and leadership of its architect, Mahbub- ul- Haq in which concern for people had given way. It met a felt need and was widely welcomed. Since then it has caused considerable academic discussion in journals and seminars. It has caught the world's imagination, stimulating criticisms and debate, ingenious elaborations, improvements and additions [Human Development Report (HDR)1999)]. This article is the outcome of a study on two villages of Bangladesh regarding human development in the light of HDR. This article comprises objectives & scope, conceptual terms, methodology, findings & analysis, recommendations etc. of the study done by the author himself.

Objectives of the Study: The study tries to address the following objectives: to measure the human development (HD) level/position of the people of sample respondents on the basis of the criteria of UNDP report, to examine the different aspects of HD which directly or indirectly influence the indicators of human development and to make some recommendations to boost up the level of human development.

Scope of the Study: The study is confined to describe the present situation relating human development of the two sample villages. In this respect demographic characteristics including age distribution pattern, occupation and level of education of the respondents, indicators of human development index, factors responsible for expectancy at birth, factors influence educational attainment, factors influence standard of living as measured by real income, income & employment and suggestions given by the respondents to improve standard of living have been highlighted.

Methodology of the Study: This is a descriptive type of research. This study was undertaken in selected two villages of Bangladesh. A total of 200 head of households residing in village "Baroguni" of Chitalmari and "Nizra" of Gopalgonj Sadar Upazila belonging in 2 districts (Chitalmari Upazila of Bagerhat district and Gopalgonj Sadar Upazila of Gopalgonj) were included in this research. Two villages from 2 Upazila were selected for undertaking this study keeping in view geographical dispersion. The respondents were selected randomly. One interview schedule was used for data collection. This interview schedule was developed in the light of the objectives of the study. The interview was meant for the head of the households of the sample villages. A total of 200 head of the households were interviewed with this schedule. This schedule covered the demographic features, present occupation, human development positions, factors influencing human development level and suggested remedial to develop the standard of the respondents. Apart from interview schedule, observation method was followed by the researcher in respect of conditions of the villagers. Besides the primary data, relevant records were reviewed to furnish the report.

Limitations of the Study: This study is based on the basis of two sample villages and respondents are only 200; time and resources were major constraints for this study. For time constraints and also for want of fund, a larger number of areas (both from urban & rural) and respondents could not be covered for the study which would have made it more representative. Hence, the findings of the study may not be the general picture of Bangladesh. Human development index deals with the average achievement of countries on the basis of certain economic and social criteria, but this does not measure the deprivation like-inequality of resources, poverty, gender disparity etc. of the society. So, this HDI may not be unanimously accepted as a indicator of the welfare of the mass.

SELECTED DEFINITION

Human Development: Human development is the process of enlarging people's choices-not just choices among different detergents, television channels or car models but the choices that are created by expanding human capabilities and functioning-what people do and can do in their lives. At all levels of development a few capabilities are essential for human development, without which many choices in life would not be available. These capabilities are to lead long and healthy lives, to be knowledgeable and to have access to the resources needed for a decent standard of living- and these are reflected in the human development index. But many additional choices are valued by people. These include political, social, economic and cultural freedom, a sense of community, opportunities for being creative and productive, and self-respect and human rights. Yet human development is more than just achieving these capabilities; it is also the process of pursuing them in a way that is equitable, participatory, and sustainable[1].

Choices will change over time and can, in principle, be infinite. Yet infinite choices without limits and constraints can become pointless and mindless. Choices have to be combined with allegiances, rights with duties, options with bonds, liberties with ligatures. Today we see a reaction against the extreme individualism of the free market approach towards what has come to be called communitarianism. The exact combination of individual and public action, of personal agency and social institutions, will vary from time to time and from problem to problem. Institutional arrangements will be more important for achieving environmental sustainability, personal agency more important when it comes to the choice of household articles or

---

[1] Human Development Report (1999), UNDP

marriage partners. But some complementarity will always be necessary (HRD-1999).

Getting income is one of the options people would like to have. It is important but not an all-important option. Human development includes the expansion of income and wealth, but it includes many other valued and valuable things as well.

For example, in investigating the priorities of poor people, one discovers that what matters most to them often differs from what outsiders assume. More income is only one of the things poor people desire. Adequate nutrition, safe water at hand, better medical services, more and better schooling for their children, cheap transport, adequate shelter, continuing employment and secure livelihoods and productive, remunerating, satisfying jobs do not show up in higher income per head, at least not for some time. There are other non-material benefits that are often more highly valued by poor people than material improvements. Some of these partake in the characteristics of rights, others in those of states of mind. Among these are good and safe working conditions, freedom to choose jobs and livelihoods, freedom of movement and speech, liberation from oppression, violence and exploitation, security from persecution and arbitrary arrest, a satisfying family life, the assertion of cultural and religious values, adequate leisure time and satisfying forms of its use, a sense of purpose in life and work, the opportunity to join and actively participate in the activities of civil society and a sense of belonging to a community. These are often more highly valued than income, both in their own right and as a means to satisfying and productive work. They do not show up in higher income figures[2]. No policy-maker can guarantee the achievement of all, or even the majority, of these aspirations, but policies can create the opportunities for their fulfilment. According to the concept of

---

[2] Ibid, P.17

human development, income is clearly only one option that people would like to have, albeit an important one. But it is not the sum total of their lives. Development must, therefor, be more than just expansion of income and wealth. Its focus must be people.

Human development, by contrast, brings together the production and distribution of commodities and the expansion and use of human capabilities. It also focuses on choices- on what people should have, be and do to be able to ensure their own livelihood. Human development is, moreover, concerned not only with basic needs satisfaction but also with human development as a participatory and dynamic process. It applies equally to less developed and highly developed countries[3].

Enrolment Ratio (Gross And Net): The gross enrolment ratio is the number of students enrolled in a level of education whether or not they belong in the relevant age group for that level-as a percentage of the population in the concerned age group. The net enrolment is the number of students enrolled in a level of education who belong in the relevant age group, as a percentage of the population in that age group.

Secondary Education: Education at the second level (International Standard Classification of Education-ISCED-levels-2 and 3), based on at least four years of previous instruction at the first level and providing general or specialized instruction or both, such as middle school, secondary school, high school, training school at this level and vocational or technical school.

Tertiary Education: Education at the third level (International Standard Classification of Education-ISCED-levels-5,6 and 7), such as universities, teachers colleges and higher professions schools- requiring as a minimum condition of admission the

[3] Human Development Report (1990).

successful completion of education at the second level or evidence of the attainment of an equivalent level of knowledge.

Gross Domestic Product (GDP): The total output of goods and services for final use produced by an economy, by both residents and non-residents, regardless of the allocation to domestic and foreign claims. It does not include deductions for depreciation of physical capital or depletion and degradation of natural resources.

Gross National Product (GNP): Comprises GDP plus net factor income from abroad, which is the income residents receive from abroad for factor services (Labour and capital), less similar payments made to non-residents who contribute to the domestic economy.

Purchasing Power Parity (PPP): Purchasing Power Parity (PPP$), considers the equilibrium EXCHANGE RATE between two currencies to be when they have equivalent domestic purchasing power, for example, if $2 (US) currently exchanges for 110 Taka, then purchasing power parity exists if those money amounts can buy the same amount of goods in their particular counties. It is based on the idea that if goods were significantly cheaper in one country, people would convert their money and buy goods there. However, this is not always practical due to transport costs and tariffs etc. In addition, exchange rates are not determined by international trade of goods and services, but by the supply and demand for foreign currency, capital transfers, government policy etc.

Real GDP Per Capita (PPP$): The GDP per capita of a country converted into US dollars on the basis of the purchasing power parity of the country's currency.

Human Development Index (HDI): The human development index measures the average achievement in a country in three basic dimensions of human development --*longevity,* knowledge

and a decent standard of living. HDI Determines Effect of Development Efforts on Human Standard of Livings.

The Key Indicators of Human Development: Human Development Report suggests that measurement of human development should for the time being focus on the three essential of human life- longevity, knowledge and decent living standards.

For the first component- longevity- life expectancy at birth is the indicator. The importance of life expectancy lies in the common belief that a long life is valuable in itself and in the fact that various indirect benefits (such as adequate nutrition and good health) are closely associated with higher life expectancy. This association makes life expectancy an important indicator of human development, especially in view of the present lack of comprehensive information about people's health and nutritional status.

For the second key component- knowledge- literacy figures are only a crude reflection of access to education, particularly to the good quality education so necessary for productive life in modern society. But literacy is a person's first step in learning and knowledge- building, so literacy figures are essential in any measurement of human development. In a more varied set of indicators, importance would also have to be attached to the outputs of higher levels of education. But for basic human development, literacy deserves the clearest emphasis.

The third key component of human development- command over resources needed for a decent living- is perhaps the most difficult to measure simply. It requires data on access to land, credit, income and other resources, but given the scarce data on many of these variables, we must for the time being, name the best use of an income indicator. The cost readily available income indicator-per capita income- has wide national coverage. But the presence of nontradable goods and services and the distortions from exchange

rate anomalies, tariffs and taxes made per capita income data in nominal prices not very useful for international comparisons. Such data can, however be improved by using purchasing-power-adjusted real GDP per capita figures, which provide better approximations of the relative power to buy commodities and to gain command over resources for a decent living standard as measured by GDP per Capita (PPP US$).

Constructing Human Development Index: The values of the variables that make up the HDI, its value ranges from 0 to 1. The HDI value for a country shows the distance that it has to travel to reach the maximum possible value of 1- or its shortfall-and also allows intercountry comparisons. A challenge for every country is to find ways to reduce its shortfall.

FINDINGS OF THE STUDY

A. DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: In this section an attempt has been made to highlight the demo graphic characteristics of the respondents, i.e., age distribution pattern, educational level and principal occupation of the respondents.

Age Distribution Patterns : In respect of age distribution pattern it is found that the highest percentage (44%) of the respondents belonged to the age group of 41-50 years followed by the respondents of the 31-40 years age group (33%). The study shows that 85% of the respondents belonged to the active age group of 21 to 50 years and remaining 15% belonged to the age group of 51-60 years and only 8% of the respondents belonged to the age group of 21-30 years.

Academic Qualification of the Respondents : The study shows that 39% of the respondents have attended primary level and 32% were illiterate. It is revealed from the table that 19% of the respondents got secondary education. It may be mentioned that only 10% of the respondents having higher secondary & bachelor

education. Thus the literacy rate of the respondents was 68% which is very closer to the national average (65.10 %).

Distribution of the Respondents by Principal Occupation : As for occupation of the respondents it may be observed that 42.50% of the respondents had the agriculture as the principal occupation followed by day labour (32.50%). 11% and 8% of the respondents who constituted the third and fourth largest occupational groups earned their livelihood through small business and rikshaw/van pulling. It is revealed from the study that only 6% was engaged in the occupation of service.

B. HUMAN DEVELOPMENT LEVEL

Life Expectancy Index [4] of the Respondents: To measure human development index, average life expectancy at birth is considered as one of the indicators which recognized in HD Report of UNDP. It is evident from the table-3.1 that average life expectancy index for the surveyed villages was 0.61 which was a little higher than the national average; this value was 0.57 in 1999 in Bangladesh (HDR-2001, UNDP). It is expected that by this time this value had risen significantly. It is revealed from the table that the life

---

[4]Measuring Human Development Index : 3 Indicators, HDI is Based on

- Longevity, as measured by life expectancy at birth,
- Educational Attainment, as measured by combination of the adult literacy rate (two-thirds weight) and the combined gross primary, secondary and tertiary enrolment ratio (one-third weight) ; and
- Standard of living, as measured by GDP per capita (PPP US $).

Computing HDI: Fixed Minimum and Maximum Value for HDI

- Life expectancy at birth 25 yrs. and 85 yrs.
- Adult literacy rate (age 15 and above) : 0% & 100%
- Combined gross enrolment ratio : 0% and 100%
- GDP per capita (PPP US $) : $ 100 and $ 40,000 (PPP US $).

For any component of the HDI individual indices can be computed according to the general formula :

Index = Actual Value – Minimum Value/Maximum Value – Minimum Value

expectancy index for the surveyed villages Baroguni and Nizra were 0.65 & 0.57 respectively which is close to each other:

Table-3.1: Life Expectancy Index of the Respondents

N=200

Village	Average Life Expectancy (April, 2002)	Life Expectancy Index
Baroguni (Bagerhat)	64	0.65
Nizra (Gopalgonj)	59	0.57
Average	61.5	0.61

Educational Attainment Index[5] of the Respondents: Educational attainment index is one of the major components to determine HD index. Table-3.2 shows that the index for educational attainment of the sample respondents of the villages, was 0.59, where the maximum value could be 1. It is evident from the table that this index for sample villages, Baraguni and Nizra were 0.60 and 0.57 respectively which are comparatively higher than the national average[6].

---

[5] Educational Attainment, as measured by combination of the adult literacy rate (two-thirds weight) and the combined gross primary, secondary and tertiary enrolment ratio (one-third weight) i.e., [2(Adult Literacy Index)+1 (Combined Literacy Index)]/3

Index =Actual Value – Minimum Value/Maximum Value – Minimum Value

[6] Human Development Report (2001) UNDP.

Table-3.2: Educational Attainment Index of the Respondents

N=200

Name of the Village	Category		Education Index
	Adult Literacy Rate(%) (April, 2002)	Combined Gross primary, secondary & tertiary enrolment rate (%) (April, 2002)	
Baroguni (Bagerhat)	56 (0.56)	69 (0.69)	0.60
Nizra (Gopangonj)	54 (0.54)	64 (0.64)	0.57
Average	55 (0.55)	66.5(0.67)	0.59

N.B. Figures in the parenthesis indicate corresponding value of index.

Real Per Capita Index in Terms of Purchasing Power Parity (PPP US$): Per capita GDP is one of the important factors to determine standard of living & thus human development position of the people. This per capita income is measured in terms of purchasing power parity instead of nominal per capita income. The PPP is considered more accurate to assess the real condition of the people. The table-3.3 shows that average per capita GDP index of the sample population of the study was only 0.245, which is far below than the national average. Human Development Report 2001 revealed that this value for Bangladesh was 0.45 (HDR-2001, UNDP). This poor condition may be due to unemployment & under employment situation and lack of appropriate wage rate and lack of income generating facility of the respondents. The table depicts that GDP index for the village of Bagerhat and Gopalgonj were 0.26 and 0.23 respectively.

Table-3.3: Adjusted GDP per Capita (PPP US$) Index[7] of the Respondents

N=200

Village	GDP Per Capita (PPP US$) (in 2002)	GDP per Capita (PPP US$) Index
Baroguni (Bagerhat)	781	0.26
Nizra (Gopalgonj)	721	0.23
Average	751	0.24

Value of Human Development Index[8] of the Sample Area: On the basis of the information presented in table-3.1, 3.2 and 3.3, human development index has been derived in table-3.4. It is revealed from the table-3.4 that in respect of the human development index (HDI) value for the sample villages were 0.48. It is worthy to mention that in these regard value of **'life expectancy index'** and **'education index'** are quite higher than the national average; but 'GDP index' of the surveyed villages are significantly lower than that of national figures (HDR, 2001, UNDP, P-136). It is evident from the table that HDI value for Baroguni and Nizra were 0.50 & 0.46 respectively which indicate the almost similar condition between the two sampled villages. It is quite transparent there is a real problems of employment opportunity in the rural area of Bangladesh and most of the rural people depend on formal agriculture and day laour sectors, and thus their real income is significantly lower than that of national average of Bangladesh shown in HDR (2001), UNDP.

---

[7] [Log (Actual value-Minimum value)]/[Log (Maximum value-Minimum value)].

Table-3.4: Human Development Index of the Sample Villages

N=200

Villages	Life expectancy at birth (year) 2002	Adult literacy rate (%) 2002	Combined Primary, Secondary & Tertiary level gross enrolment ratio (%) 2002	Real GDP Per capita (PPP$) 2002	Life expectancy Index	Education Index	GDP index	Human Development Index (HDI) Value 2002
Baroguni (Bagerhat)	64	56	69	781	0.65	0.60	0.26	0.50
Nizra (Gopalgonj)	59	54	64	721	0.57	0.57	0.23	0.46
Average (Sample villages)	61.5	55	66.5	751	0.61	0.59	0.24	0.48

D. FACTORS RESPONSIBLE FOR HUMAN DEVELOPMENT

Respondents were asked to point out the factors responsible for human development. They pointed out as many as 11 factors for life expectancy, 7 factors for educational attainment and 8 factors for GDP index, which directly or indirectly affected HD. Apart from these, the respondents identified 12 factors, those influence to measure overall human development. These factors are discussed in the followings:

Factors Responsible for Life Expectancy Index: The respondents were asked to mention their opinion in respect to factors responsible for life expectancy. They opined as many as 11 factors in terms of their magnitude (table-3.5). Eighty-two percent respondents replied that the condition of safe delivery, pre and post natal care are 'very bad' & 'bad', only 4% viewed that the condition was good. The table shows that 100% of the respondent viewed that availability of pure drinking water' in the locality is 'bad & very bad'. It may be noticed from the table that 78% replied that condition of availability of doctors were 'very bad & bad' and 48% replied & viewed that they had insignificant purchasing power of medicine. Regarding sanitary facility, knowledge about family planning, diarrhoea protection, housing condition, and health consciousness majority of the respondents (>60%) opined that the conditions were moderate. 84% of the respondents opined that they had been provided vaccine effectively. None of the respondents answered very good about these eleven variables, those generally influence life expectancy.

Table-3.5: Degree of Opinion of the Respondents about the Factors Responsible for Life Expectancy

N=200

Factors	**Degree of Responsiveness (%)**				
	Very Bad (20)	**Bad (20)**	**Moderate (41-60)**	**Good (61-80)**	**Very Good (81+)**
Safe delivery & pre/ post maternity care	22	60	14	4	-
Medical facilities including availability of doctors/physicians	26	52	16	6	-
Capability to procure medicine	16	32	42	10	-
Availability of pure drinking water	38	62	-	-	-
Sanitary facility	8	16	64	12	-
Vaccine provided for family members	-	-	16	84	-
Knowledge of diarrhoea protection	6	12	68	14	-
Housing condition	10	22	60	8	-
Knowledge of family planning method	4	14	66	16	-
Knowledge about environment	20	36	34	10	-
Health consciousness	12	18	58	12	-

Factors Responsible for Educational Attainment: The respondents were asked to mention the factors those directly or indirectly influenced their level of education. Most of them replied that facility for schooling of the children & opportunity of informal education, level of income & employment, communication and transport facility, security to move and meaningful objective of life generally influence the level of educational attainment. And majority of the respondents viewed that, they were enjoying moderate facility in these regards (table-3.6). A very few percent of the respondents replied that the conditions of the variables are 'good or very good'. In respect of security to move 26% mentioned that the condition is 'good' followed by very good only 4% .

Table-3.6: Degrees of Opinion of the Respondents about the Factors Responsible for Educational Attainment

N=200

Factors	Degree of Opinion/Responsiveness (%)				
	Very Bad (20)	Bad (20)	Moderate (41-60)	Good (61-80)	Very Good (81+)
Facility for Schooling of the Children	8	18	66	8	-
Facility for informal education	16	24	50	10	-
Level of income	12	14	62	12	-
Level of employment	18	26	52	4	-
Communication & Transport Facility	8	16	70	6	-
Security to move	2	4	64	26	4
Meaningful objective of life	6	22	68	4	-

Factors Responsible for Real GDP per Capita /Purchasing Power: To find out the causes of low purchasing power of the respondents, they were asked to mention the causes of the fact. It is revealed from the table-3.7 that 74% of the respondents replied 'lack of technical knowledge & skill' as one of the indicators for their low per capita income, on the other-hand, 94% replied that adverse condition, of 'capital accumulation and loan' was responsible for their poor condition of income. It is depicted from the table that more than fifty percent of the respondents mentioned themselves in 'moderate' condition in respect of 'employment ', and 'level of income & wages'. A very few percent (22%) of them claimed that in respect of receiving loan they were enjoying 'good & very good' position/ facility.

Table-3.7: Degree of Opinion of the Respondents about the Factors Responsible for GDP Per Capita (PPP US$)

N=200

Factors	Degree of Responsiveness/Opinion (%)				
	Very Bad (20)	Bad (20)	Moderate (41-60)	Good (61-80)	Very Good (81+)
Employment opportunity	20	24	54	2	-
Technical knowledge & skill	60	14	26	-	-
Level of education	10	26	62	2	-
Capital accumulation & loan	88	6	6	-	-
Condition of receiving loan	4	14	60	12	10
Availability of appropriate technology	8	28	56	8	4
Rate of income & wages	14	52	34	-	-
Overall economic condition	14	24	62	-	

Factors Responsible for Overall Human Development : Opinion of the respondents about the factors responsible for overall human development index (HDI) may be shown in table-3.11. In this regard the sample population point out following aspects for influencing overall human development position:

> freedom to move and speech ,secured & easy livelihood political, cultural and social freedom ,freedom from arbitrary arrest ,satisfying and peaceful family life,effective participation in decision making ,self confidence,civic consciousness,recreation facility &knowledge & ideas to uplift overall conditions of society.

It is revealed from the table-3.8 that more than 86% of the respondents opined that they were either in 'moderate' or 'good' or 'very good' position in terms of the factors mentioned from a to f, while the conditions mentioned in clause g, are not moderate or good enough. It is depicted from the table that in respect of the factors mentioned in a-g, only 8-16% respondents opined that they were in a 'very good' position.

Table-3.8: Degree of Opinion of the Respondents about the Factors Responsible to Measure Overall Human Development Index (HDI)

N=200

Factors	**Degree of Opinion (in %)**				
	Very Bad (20)	**Bad (20)**	**Moderate (41-60)**	**Good (61-80)**	**Very Good (81+)**
a. Easy & secure livelihood	4	6	58	24	8
b. Freedom to move & speech	2	4	44	36	14
c. Political, Social & Cultural Freedom	4	6	46	32	12
d. Freedom from Oppression	6	8	30	40	16
e. Freedom from arbitrary arrest	-	8	48	28	16
f. Satisfying & peaceful family life	4	8	56	26	8
g. Effective participation in decision making	2	4	46	44	8
h. Consider to one of the important members of the society	20	26	30	20	4
i. Self Confidence	24	26	26	24	-
j. Civic Consciousness	14	26	38	22	-
k. Recreation facilities	12	16	40	32	-
l. Knowledge & ideas to uplift overall conditions of society	8	14	40	30	8

E. Suggestions of the Respondents to Improve the Level of Human Development Index: To improve the human development index, opinions were sought from the respondents. In this regard, they suggested more than a dozen of opinions. The study shows that 94 percent of the respondents strongly recommended to ensure 'supply of pure drinking water' followed by 82 percent of the respondents who advocated to 'provide primary health care facility'. It is observed from the table that most of the respondents (70-78%) opined in-favour of extension the service of 'standard sanitary latrine, universal primary and adult education, create employment opportunity, skillful & technical education' and materialize the slogan of "health for all" as tools of improvement of human development. It is also evident from the table that 64%, 58%, 44% and 36% percent respondents viewed to remove urban and rural disparity, establish social justice, remove corruption and eliminate terrorism respectively to uplift human development level and standard of living.

ANALYSIS OF THE STUDY

The study reveals wide variation in the level of education of the villagers and it is noticed that more than 58 percent respondents belong to primary and secondary level. This gloomy picture may be on account of lack of educational facilities and communication barriers in the sample areas. It is found from the study that most of respondents (83%) belong to traditional occupation sectors like agriculture, day labour followed by only 17% as non-traditional sector. It is revealed that in this case transformation of occupation is insignificant and people may not have scope to prefer productive occupation.

It is depicted that life expectancy index (LEI), where average value of life expectancy is 0.61, which may be considered substantial in respect of rural sample areas. It may be noted that LEI is increasing day by day due to the positive responses of the

government. It is revealed from the **Appendix table-5** that LEB in 1990, 1992, 1995, 1998. 1999, 2000 and 2001 were 52, 51.8, 52.2, 56.9, 58.1, 58 and 58.9 respectively and the corresponding value for life index were 0.44, 045, 0.53, 0.55, 0.55, 0.56 and 0.57. This information shows that over the years LEB of Bangladesh has improved. **Appendix table-1** shows that, though our LEB is increasing over the years, we are still behind in comparison with Sri Lankan, Maldives and even other SAARC countries. Hence, we have a lot of scope to improve the situation.

Education is the backbone of a nation. There is a positive correlation between education and development. The nation will be more developed, which one is more educated and vice-versa. The study shows that average educational attainment rate of adult and combined literacy rate are 55 and 66.5 percent respectively and educational attainment index is 0.59. This proves that good number of people are being covered under the umbrella of education compared to our national average. The **Appendix table-2** shows that the adult literacy rate varies from 33 to 40.8 percent during 1990 to 2001 and combined educational attainment rate was 35 to 37 percent during the year 1999 to 2001 and the value of educational attainment index was 0.39 in 2001(**Appendix table-5**).

This study shows that purchasing power of the people is very limited, and GDP index is only 0.24(tabe-3.6) which is quite lower than the national average, 0.45 (HDR-2001). It is revealed from the study that HDI value for the sample areas is 0.48 which is almost close to our national value (0.47).

The researcher tried to explore the factors responsible for affecting human development. It was found that scarcity of pure drinking water, non-safe delivery of children, insufficient medical facility, lack of knowledge about environment were responsible for low value of life expectancy at birth. It is depicted from the study that

schooling facility, informal education, level of income & employment, communication and transport facility etc affect educational attainment level of the people. As per the opinion of the respondents, the influencing variable to determine GDP per capita index are employment opportunity, technical knowledge & skill, level of education, capital accumulation and credit facility, rate of wage & income etc. And it is reflected from the study that the rural respondents had only restricted access to these variables.

The study revealed that the human development position of the sample respondents in various aspects are not satisfactory and even most of them are not enjoying the minimum facility which generally influence their living standard.

Recommendations and Conclusion

RECOMMENDATIONS

The findings and analysis of the study shows that the villagers of the sample areas were not in good conditions in terms of health and nutrition, educational attainment, income, employment, savings and standard of living. The following recommendations may be considered to uplift the living standard and thus to augment the human development index of the people.

(i) Create Income and Employment Opportunity: It is observed from the study that villagers were in moderate conditions in-terms of freedom of movement and speech, secure and easy livelihood, social and political freedom, satisfying and peaceful family life. To increase human development level of the rural people priority is to be given to create income and employment generating activities in rural Bangladesh. Most of the villagers were seasonally unemployed, they were not able to develop self-employment due to scarcity of capital, required level of education and proper training. After accomplishment of formal and informal training the villagers may be provided reasonable loan, at a very

low rate of interest to start income generating activities. This process may also help to reduce the magnitude of the problems of unemployment of the youth of the villagers. In this regard credit facility should be extended for the people to avail appropriate technology, technical knowledge and skill.

It is needless to mention that, it may not always be possible for the government agencies to create income and employment generation activities; NGOs may also play the role as supplementary agency rather competitive partner of the government. Non–government organizations may be given the responsibilities to disburse loans for the poor. Hence, necessary policies should be made so that non–government voluntary organizations may come forward to assist the government programs in these aspects.

(ii) Provide Basic Facilities: It was observed that most of the respondents lacked in basic facilities, which are greatly responsible to develop human conditions. The villagers did not have adequate access to pure drinking water. The respondents had little access to medical and sanitary facilities. Most of them advocated for health care facilities, transport system etc. In this situation government may provide one sanitary latrine to each family, one tube-well for every 10 families. To provide pure drinking water, government may provide one deep tube-well in every village and one arsenic free tube-well for every 7 families; for providing medical facilities and primary health care one health sub-centre may be established in each gram of Bangladesh.

(iii) Expansion of Educational Facilities: In this respect it was found that both the adult & general literacy rate are low in sample villages. But it is pertinent to mention that HD is greatly influenced by educational attainment rate. Now, it is required to ensure the quality of education and utilization of existing governmental and non- governmental educational facilities and expand the facility for adult and general literacy rate to improve the standard of people of the rural areas.

(iv) Provide Training Facility : To improve the economic condition of the households, training should be extended specially for Women in different trades like handicrafts, sewing etc., so that they can contribute significantly to raise the income, which ultimately help to uplift their fate. These programs should be launched through different development agencies of the governments. In this regards non- governmental organisations may also come forward to act with the government to make the programmes effective. Instead of general training skill oriented and technical types of training should be provided to the active labour force of rural areas.

(V) Remove Corruption & Establish Social Justice: Social justice may be one of the important function to develop standard of living of the people and in this regard corruption should be removed from all spheres of life, so that maximum social service may be ensured.

(vi) Launching Motivation Programmes: We must acknowledge that self-realization is the pre-condition to solve any sort of problem. If the people really feel that their fate can not be developed without their self-feeling, i.e., they have to feel, it is not government and other agencies to solve their problems, it is themselves who can be able to change their fate. In this regards, motivational programme have to be launched by the concerned local government representatives, and by the relevant authority for the inhabitants, so that the villagers do not solely depend on government to solve their problems and thus to improve their living standard.

CONCLUSION

All three measures of human development suffer from a common failing: they are averages that conceal wide disparities in the overall population. Different social groups have different life expectancies. There are wide disparities in male and female literacy. And income is distributed unevenly. Progress in human development has two perspectives. One is attainment: what has

been achieved, with greater achievements meaning better progress. The second is the continuing shortfall from a desired value or target. In many ways the two perspectives are equivalent- the greater the attainments, the smaller the shortfalls.

There are different dimensions of the problem in the surveyed areas. These should be address on the basis of the felt need of the respective people. People should be more involved in decision making while the collective programmes will be launched to improve their fate. Human development can not be achieved within a shortest possible time, it is not the process to gain any thing without efforts. Appropriate policies, programs, methods and action should be taken by the government to achieve this indicator of development. We should remember that it is not only the governmental responsibility to improve the existing situations but people and all section of ours also have to think appropriately to present a meaningful process and way to overcome the barriers. Collective efforts can be tolls to reach and achieve reasonable human development position compare to other countries of the world.

BIBLIOGRAPHY

1. United Notions Development Programme (UNDP), **Human Development Reports(1990-2002).**

2. World Bank, **World Development Reports, (1990-2002).**

3. United Notions Development Programme (UNDP), **South Asian Human Development Report (1990-2001).**

4. Bangaldesh Institutite of Development Studies (BIDS), **Fighting with Poverty, Human Development in Bangladesh (2002), Dhaka.**

5. M/O Planning , Government of Bangladesh. **Statistical Year Book (2001),**

6. M/O Finance, Government of Bangladesh. **The Economic Survey (2000-2001),**

APPENDIX TABLE

Table-1: Human Development Indicator: Life Expectancy at Birth (in year)

Country	**Year**							
	1990	**1991**	**1992**	**1994**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**
Bangladesh	52	51.8	51.8	52.2	56.9	58.1	58	58.9
Bhutan	49	48.9	48.9	47.2	52	60.7	61	61.5
India	59	59.1	59.1	59.7	61.6	62.6	63	62.9
Maldives	n/a	62.5	62.5	62.6	63.3	64.5	65	66.1
Nepal	52	52.2	52.2	52.7	55.9	57.3	56	58.1
Pakistan	58	57.7	57.7	58.3	62.8	64	64	59.6
Sri Lanka	71	70.9	70.9	71.2	72.5	73.1	73	71.9

Source: HDR, 1990-2001

Table-2: Human Development Indicator: Adult Literacy Rate (in %)

Country	Year							
	1990	**1991**	**1992**	**1994**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**
Bangladesh	33	32.2	35.3	36.6	38.1	38.9	39	40.8
Bhutan	25	32.2	38.4	40.9	42.2	44.2	44	42
India	43	44.1	48.2	49.8	52	53.5	54	56.5
Maldives	n/a	93	95	92	93.2	95.7	96	96.2
Nepal	26	22.4	25.6	27	27.5	38.1	38	40.4
Pakistan	30	31	34.8	36.4	37.8	40.9	41	45
Sri Lanka	87	86.7	88.4	89.1	90.2	90.7	91	91.4

Source: HDR, 1990-2001

Table-3: Human Development Indicator as per HDR: Combined Primary, Secondary and Tertiary Enrolment Ratio (in %)

Country	Year			
	1998	1999	2000	2001
Bangladesh	37	35	35	37
Bhutan	31	12	12	33
India	55	55	55	56
Maldives	71	74	74	77
Nepal	56	59	59	60
Pakistan	41	43	43	40
Sri Lanka	67	66	66	70

Source: Human Development Report, 1990-2001.

Table-4: Human Development Indicator as per HDR: Real GDP per Capita (in PPP US$)

Country	Year							
	1991	**1992**	**1994**	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**
Bangladesh	720	820	1160	1290	1382	1050	1050	1483
Bhutan	750	750	620	790	1382	1467	1467	1471
India	870	910	1150	1240	1422	1670	1670	2248
Maldives	1050	1118	1200	2200	3540	3690	3690	4423
Nepal	770	896	1130	1000	1145	1090	1090	1341
Pakistan	1790	1789	1970	2160	1145	1560	1560	1834
Sri Lanka	2120	2253	2650	3030	3408	2490	2490	3279

Source: HDR, 1990-2001

Table-5: Human Development Index of Bangladesh Over the Years: Real GDP per Capita (in PPP US$)

YEAR	INDICATORS								
	LEB(yr.)	LEIndex(yr.)	ALR(%)	CEAR	EduIdex	GDPC(PPP$)	GDP Idx	HDI Rank	HDI Value
2001	58.9	0.57	40.8	37	0.39	1483	0.45	132	0.47
2000	58.6					1361	0.39	146	0.46
1999	58.1		38.9	35	0.38	1050	-	-	0.44
1998	58	0.55	39	35	-	1050	-	-	-
1997	58.1	0.55	38.9	35	-	1050	-	-	-
1995	56.9	0.5	38.1	37	-	1382	-	-	-
1992	52.2	0.45	36.6	n/a	-	1160	-	-	-
1990	51.8	0.44	35.3	n/a	-	820	-	-	-
1987	50.2	0.42	32.2	n/a	-	720			-

Source: Human Development Report (1990-2001),UNDP

Note: LEB =Life Expectancy at Birth, LEIndex= Life Expectancy Index

ALR= Adult Literacy Rate, CEAR= Combined Educational Attainment Rate

EduIdex = Educational Index, GDP Idx= GDP Index

GDPC = GDP per Capita,

HDI=Human Development Index

লোকপ্রশাসন সাময়িকী বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন কেন্দ্রের অন্যতম নিয়মিত প্রকাশনা, এটি কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক জার্ণাল। প্রতি ইংরেজী বছরের জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে এ সাময়িকী প্রকাশিত হয়। লোক প্রশাসন সাময়িকীতে কেন্দ্রের অনুষদ সদস্য, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ কর্তৃক বাংলা বা ইংরেজী ভাষায় লিখিত সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তবে লোক-প্রশাসন, উন্নয়ন অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক লেখা অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়।

◆ প্রবন্ধটি মৌলিক এবং অন্য কোন জার্ণালে বা সাময়িকী, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়নি-এ মর্মে প্রবন্ধ জমা দেয়া বা প্রেরণের সময় একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করতে হবে।

◆ লেখা মানসম্পন্ন সাদা কাগজে (রিপোর্ট সাইজ) পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে এক পৃষ্ঠায় ১২ ফন্টে ডাবল স্পেসে কম্পিউটারে মুদ্রিত হতে হবে। মূল পাণ্ডুলিপির সংগে অবশ্যই কম্পিউটার ডিস্কেটে প্রবন্ধ প্রেরণ করতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফন্টের ব্যবহার অনুসরণ করতে হবেঃ বাংলা কম্পোজ ঃ "বিজয় সুতন্নি" ফন্ট

ইংরেজী কম্পোজ ঃ "টাইমস নিউ রোমান" ফন্ট

◆ প্রেরিতব্য কম্পিউটার ডিস্কেটের কভারে লেখকের নাম, লিখিত প্রবন্ধের নাম এবং সংশ্লিষ্ট ফাইলের নাম উল্লেখ থাকতে হবে।

◆ প্রবন্ধে বাংলা একাডেমী অনুমোদিত বানান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

◆ মূল কপিসহ পাণ্ডুলিপির ২(দুই) প্রস্ত (পরিচ্ছন্ন কপি) সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধের উপর আলাদা কাগজে (কভারপেজ) প্রবন্ধের শিরোনামসহ লেখকের নাম, পদবী ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে, প্রবন্ধের কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না।

◆ ভিন্ন কাগজে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রবন্ধের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

◆ প্রত্যেক লেখার সাথে অবশ্যই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার (Abstract) ইংরেজীতে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।

◆ প্রবন্ধের পাদটীকায় ও তথ্যপঞ্জিতে লেখক, গ্রন্থ স্থান, প্রকাশক, বছর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, সাময়িকীর নাম, খণ্ড ও ইস্যু সংখ্যার বছর ও পৃষ্ঠা প্রচলিত প্রমিত নিয়ম (Standard) অনুসারে উল্লেখ করতে হবে।

◆ লেখা প্রকাশিত হলে লেখক সাময়িকীর ৫ কপি অনুলিপি বিনামূল্যে পাবেন।

◆ প্রাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ও ডিস্কেট সাধারণত লেখককে ফেরৎ দেয়া হয় না, তবে বিশেষ প্রয়োজনে ফেরৎ পেতে হলে এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার লেখককে বহন করতে হবে।

◆ মুদ্রিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠার (২৫০ থেকে ৩০০ শব্দের পৃষ্ঠা) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হবে, এক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুসারে প্রাপ্য সম্মানী থেকে এক-তৃতীয়াংশ কর্তন করা হবে।